সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

হেডস্যার

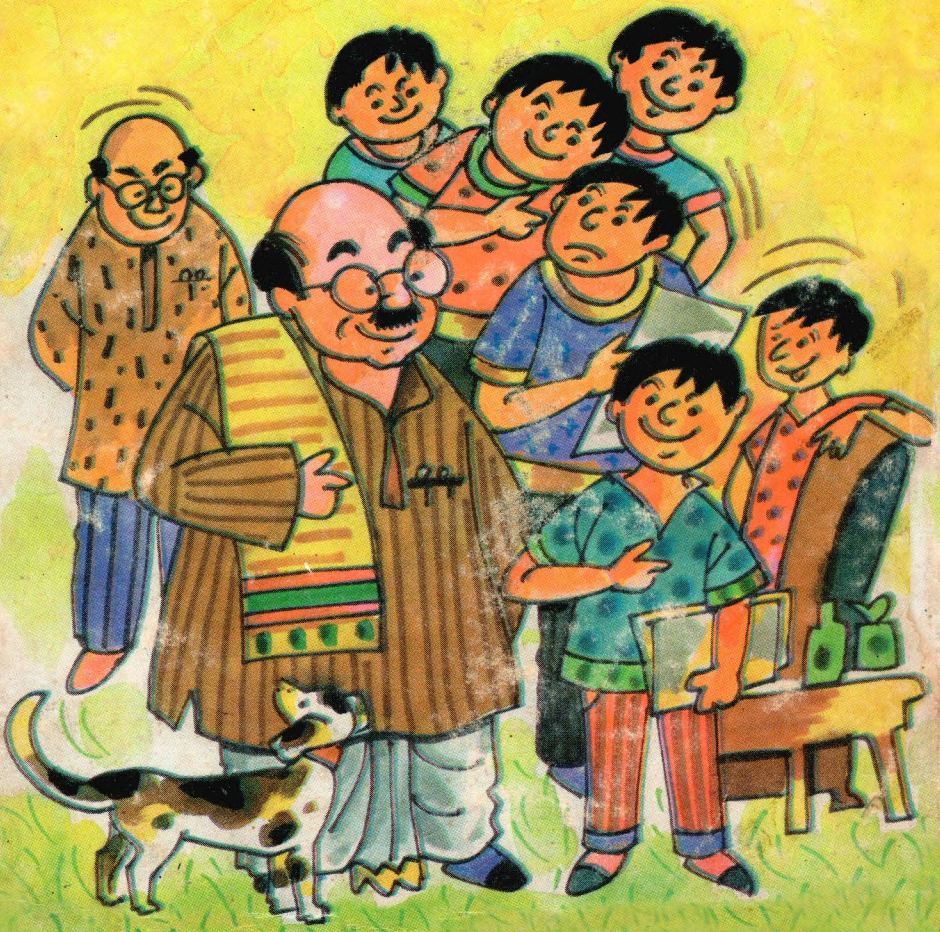

হেডস্যার ❖ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

হেডস্যার

পুষ্প

৫৭ এ-ব্লক বাঙুর অ্যাভিন্যু, কলকাতা - ৭০০ ০৫৫

HEAD SIR
Selected Short Children Stories
By- Sanjiv Chattopadhyay
Rs. 40=00

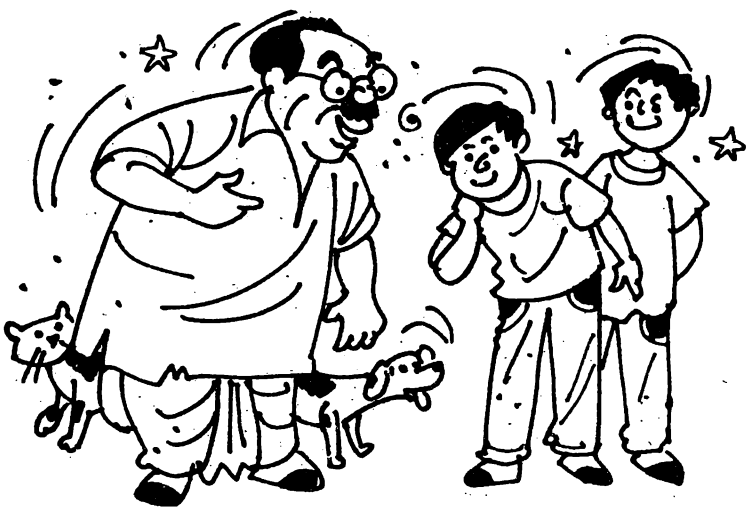

প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি- শংকর বসাক

প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২৯ জানুয়ারি ২০০৩। প্রকাশক ভারতী দত্ত। পুষ্প, ৫৭এ-ব্লক বাঙুর অ্যাভিন্যু, কলকাতা ৭০০০৫৫। বর্ণ গ্রন্থনে : শিভা গ্রাফিক্স, ৩৩/৩৩/১ চেতলা সেন্ট্রাল রোড, সি. আই. টি মার্কেট, কলকাতা-৭০০০২৭। মুদ্রণে : নিউ অন্নপুর্ণা প্রেস গোয়াবাগান স্ট্রীট কলকাতা । প্রধান পরিবেশক : ঘোষ লাইব্রেরি, ১৩ বি ব্লক বাঙুর অ্যাভিন্যু, কলকাতা- ৭০০ ০৫৫

৪০-০০

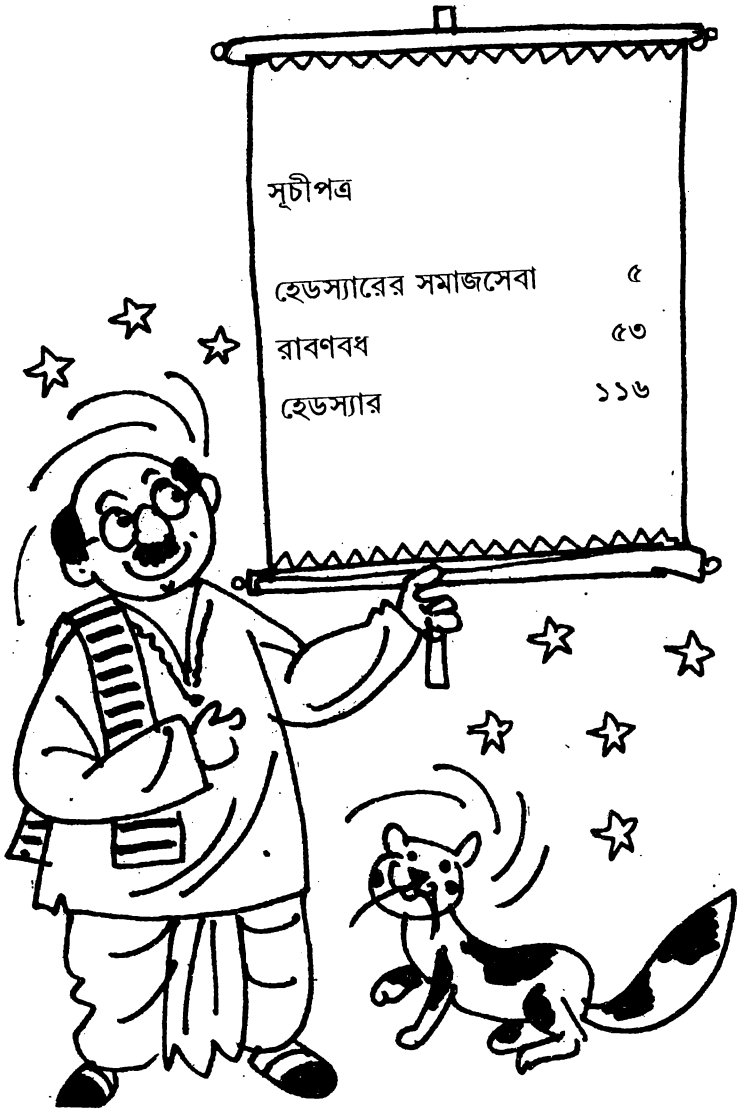

সূচীপত্র

হেডস্যারের সমাজসেবা ৫

রাবণবধ ৫৩

হেডস্যার ১১৬

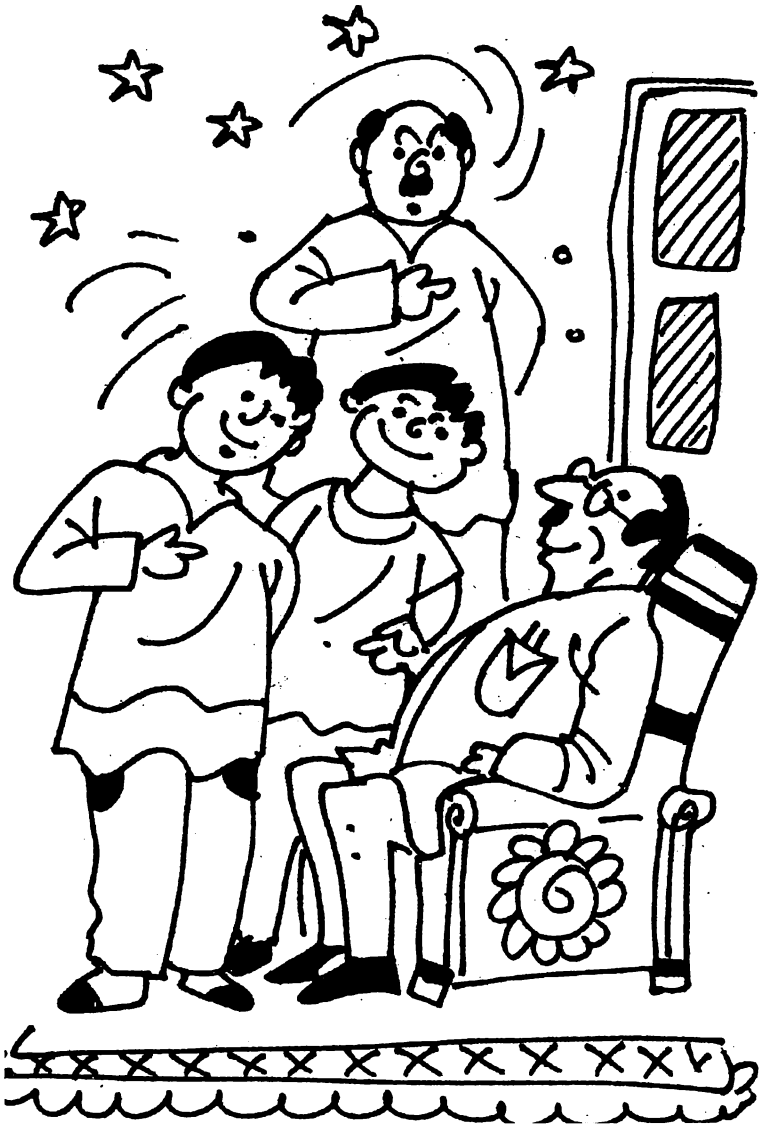

হেডস্যারের সমাজসেবা

হেডমাস্টারমশাই আজ তিনটের সময় স্কুলের নিউ হলে একটা মিটিং ডেকেছেন। আমাদের ক্লাস টেনের দশজন ছেলে সেই মিটিং-এ হাজির থাকবে। তার মধ্যে আমার নামও আছে। সকাল থেকে নিজেকে খুব ইম্পর্ট্যান্ট লাগছে। কথায় কথায় হ্যা-হ্যা করে আর হাসতে ইচ্ছে করছে না। বাবার দাড়ি কামাবার সেটটা দেখে ইচ্ছে করছে আমিও দাড়ি কামাই। দাড়িই নেই তো দাড়ি কামাব। আফটার শেভ লোশনের খানিকটা হাতে ঢেলে মুখে মাখলুম। আমার দিদি রুমা দেখতে পেয়ে বলল, "ওইসব মাখছিস তো, দেখবি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বেড়িয়ে যাবে। তখন বুঝবি ঠেলা। বড়ো হওয়ার জন্যে যেন আর তর সইছে না।"

কী বোকার মতো কথা বলে! মিনিটে-মিনিটে সবাই বড়ো হচ্ছি আমরা। অটোমেটিক্যালি। লোশন মাখি আর না মাখি দাড়ি আমার বেরোবেই। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। গলার স্বরটা কেমন যেন একটু মোটা-মোটা হয়েছে। চিৎকার করে যখন মা বলে ডাকি, আমার জামা কোথায়, তখন চমকে উঠি, এ কী রে ভাই! বাবার গলা না কী! —'হ্যাঁ গো, আমার ব্যাগটা কোথায় রাখলে!'

মা হওয়ার কী মজা! সকলের সব দায়িত্ব মায়ের। দাদু চিলেকোঠা থেকে হাঁক মারছেন, "বউমা, আমার চশমাটা কোথায় ফেলে দিলে! তোমার গোছানোর ঠেলায় আমি পাগল হয়ে যাব।" মুদিখানার জিনিস এসেছে, চেল্লাচ্ছে, "ফর্দ মিলিয়ে জিনিস বুঝে নিন।" জমাদার চিৎকার করছে, "মা, পয়সা দাও।" বোন বায়না ধরেছে, "মা, আমি আজ শাড়ি পরব।"

এতসব ঝঞ্ঝরঝাঁইয়ের মধ্যেও মায়ের মুখে সবসময় হাসি। মাকে আমার যে কী ভালো লাগে! পৃথিবীতে এমন মা আর হবেন না।

বাবা! থ্যাঙ্ক ইউ। এমন একজন মা উপহার দিয়েছ বলে তোমাকে থাউজেন্ড থ্যাঙ্কস।

কখন মা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি। কথা শুনে

চমকে উঠেছি, "কী ব্যাপার! আজ এত সাজের ঘটা। স্কুলে যাচ্ছিস, না বিয়ে করতে যাচ্ছিস?"

মায়ের যেমন কথা! বিয়ে বললে, কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করে। আমি যখন বহুত বড়ো হয়ে যাব, তখনও আমি বিয়ে করব না। আমি তো এঞ্জিনিয়ার হব। ব্রিজ বানাবার এঞ্জিনিয়ার। বাইরে, দূর-দূর দেশে চাকরি করব। সেখানে আমার মাকে নিয়ে যাব। বিরাট কোয়ার্টার। চারপাশে বাগান। ফুলে-ফুলে ভরা। ওই তো একটু দূরেই আকাশের গায়ে নীল পাহাড়। সেখানে আবার একটা ঝরনা আছে। আমার একটা গাড়ি থাকবে। বিকেলে মাকে নিয়ে বেড়াতে যাব। মাকে সুখে রাখতে হবে, ভীষণ সুখে, তা না হলে আমি ছেলেই নই।

"জানো মা, আজ আমাদের মিটিং আছে। হেডমাস্টারমশাই আমাদের পনেরোজনকে স্পেশ্যাল মিটিং-এ ডেকেছেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। খুব সম্মান লাগছে।"

রুমা একটু ব্যঙ্গ করে বলল, "গাড়ি পাঠাবে তো, বিশেষ অতিথি, সম্মানিত অতিথি!"

"শোন দিদি, আজ আমাকে টন্ট করছিস তো, কর, করে যা; তবে তোকে অমি বলে রাখছি, একদিন আমাকে নিতে গাড়ি আসবে। আসবেই আসবে। যেভাবেই হোক আমি ফেমাস হব। চ্যালেঞ্জ।"

আমাকে আমার যোগের মাস্টারমশাই বলেছেন, "শানু! থিঙ্ক টল, ইউ উইল বি টলার; থিঙ্ক গ্রেট, ইউ উইল বি গ্রেটার। থিঙ্ক স্ট্রং, ইউ উইল বি স্ট্রংগার। এই নে পড়, পড়ে দ্যাখ স্বামীজি কী বলছেন, 'যদি জড়জগতে বড়ো হতে চাও, তবে বিশ্বাস করো তুমি বড়ো। আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়তো পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও আমাদের উভয়েরই পিছনে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখান হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস করো।" আমার এই যোগের গুরুর নাম সন্তোষ দেবদাস। কখনও পণ্ডিচেরীতে, কখনও কলকাতায় থাকেন। কত যে বয়স হল, আশি, একাশি, তবু কী শক্তি, কী ভয়ঙ্কর মনের জোর! যে-কোনও পালোয়ানকে একটা থাপ্পড় কষালে কাত হয়ে যাবে। আমাকে

বলেছেন, 'স্বামীজির এই কথাটার উপর ধ্যান লাগাবি ঃ

এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহা ওই সর্ষপ বীজের অষ্টমাংশের তুল্য ক্ষুদ্র বীজে ছিল —

ওই মহাশক্তিরাজি উহার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে।'

দিদি! তোকে আমি সেই শক্তির খেলা দেখাব। আমি যখন বড়ো হব, আরও বড়ো, তখন তোর বিয়ে হয়ে যাবে। তোর শ্বশুরবাড়িতে আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে যাব। কত মিষ্টি, সিল্কের কাপড়, সোনার ঘড়ি নিয়ে যাব। ছ'ফুট লম্বা, ইয়া মাস্‌ল, আটচল্লিশ বুকের ছাতি। একমাস ভারতবর্ষে থাকি তো তিনমাস ভারতের বাইরে। আমি রকেট এঞ্জিনিয়ার হব। হবই হব। অঙ্কটা আমার খুব ভালোই আসে। ক্যালকুলেশান করে এমন একটা রকেট ছাড়ব, এইসব গ্রহনক্ষত্র পার হয়ে আর এক বিশ্বে চলে যাবে। কী খাতির আমার! প্রোফেসর শঙ্কুর মতো।

এইসব ভাবতে-ভাবতে স্কুলে। গিজগিজ করছে ছেলে। অনেক ভালো-ভালো ছাত্র এখান থেকে বেরিয়ে গেছে। নিউ হলের তিনটে দরজার একটামাত্র খোলা। ভেতরে মাস্টারমশাই ও ছাত্ররা। আমি একটু দেরি করে ফেলেছি। ভেরি ব্যাড। এমন হওয়া উচিত নয়। বাবা বলেছেন, 'এমনভাবে সময় রাখবে, যেন তোমাকে দেখে লোকে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারে।' কী করব, ওই বিশুটার জন্য দেরি হয়ে গেল। 'কোথায় যাচ্ছিস শানু?' এই উত্তরটা দিতে গিয়েই হল কাল। স্কুলে গেলেও ব্যাপারটা যে ক্লাস নয়, হেডমাস্টারমশাইয়ের স্পেশ্যাল মিটিং, সেটা না বললে তো মিথ্যে কথা বলা হবে। সেই শুরু হল, 'কীসের মিটিং, কেন মিটিং, সেই মিটিং-এ তুই যাচ্ছিস কেন! মিটিং-এ কী খাওয়াবে!' বিশুটা মহা পেটুক। আধবালতি খিচুড়ি খেয়ে ফেলে। নেমন্তন্ন খেতে গেলে বড়োরা ব্যাপারস্যাপার দেখে শেষমেশ কান ধরে টেনে তুলে দেন। বাইশটা কমলাভোগ খেয়ে আবার! বাড়ি গিয়ে জোয়ানের আরক খা। খাবারটা পরের, পেটটা তো তোর নিজের! আত্মহত্যা করার ইচ্ছে!

আমাদের হেডমাস্টারমশাইয়ের চেহারাটা একটু মোটার দিকেই। থলথলে। ওই যে কলেজে পড়ার সময় ওয়াই এম সি এ-তে কুস্তি করতেন, ভেবেছিলেন জাপানে গিয়ে সামুরাই হবেন, সেই হল কাল। চৌষট্টিটা ডিমের

তাগড়া ওমলেট, এক কেজি বাদাম বেটে শরবত, পাঁচ সের দুধ, এক কেজি মালাই। শেষে দরজা-জানলা কাটার অবস্থা। কাঠের খাটে শুতে ভয় পেতেন। রিইনফোর্সড কংক্রিটের খাট তৈরি করিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের পাঞ্জাবিতে তিনগজ কাপড় লাগে। ওঁর লাগত ছ'গজ। সে ভালোই, পর্বতের মতো চেহারা হওয়াটা কিছু খারাপ নয়। সমস্যা হল বাসে, ট্রামে, ট্রেনে খুব অসুবিধে। ফাঁকা মাঠে মানিয়ে যায়। বাড়িতে বড্ড বড়ো দেখায়। আরও কত যে বড়ো হতে পারতেন তিনি নিজেও জানতেন না, একটা দুর্ঘটনায় সব বরবাদ।

গল্পটা আমাদের বলেছিলেন। সাধারণ মানুষের জীবনে অমন ঘটনা ঘটলে গল্পটা বলার জন্য বেঁচে থাকতেন না। এমারেল্ড সার্কাসে গিয়েছিলেন মাস্টারমশাই। মালিক খাতির করে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন সন্ধের শোতে। অতবড়ো একজন মানুষ! সব দিক থেকে বড়ো। লেখাপড়ায় ভীষণ ভালো। সবেতেই ফার্স্ট। একবার তাঁকে সেকেন্ড করেছিল। মাস্টারমশাই প্রতিবাদে অনশন শুরু করলেন। একদিন গেল, দু'দিন গেল। সকলের কত অনুরোধ! জীবনে একবার না হয় সেকেন্ড হলে বিমান! তোমার জন্য কি কেউ কোনওদিন ফার্স্ট হতে পারবে না! এ তো তোমার ভারী অন্যায় গোঁ বাবা! শেষে অনশনের তৃতীয় দিনে হেডমাস্টারমশাইয়ের হেডমাস্টারমশাই ঘোষণা করলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিমানের খাতা রিএগজামিন করা হবে। খাতার বান্ডিল খুলে পরীক্ষা শুরু হল। সারা স্কুলবাড়ি থমথমে। কী হয়, কী হয়! এরই মাঝে বিমান কুঁই-কুঁই করে বলল, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য নম্বর বাড়ানো চলবে না। সবাই বললেন, 'সে তোমাকে ভাবতে হবে না।' যে ফার্স্ট হয়েছে তার দলবল অলরেডি স্লোগান দিতে শুরু করেছে। বেলা তিনটের সময় হেডমাস্টারমশাই স্কুলের লনে নেমে এসে বললেন, 'দেয়ার ওয়াজ এ গ্রেট মিস্‌টেক। অঙ্কের খাতায় একটা নম্বর যোগ করতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। ওভারসাইট। বিমানের দশটা নম্বর বেড়ে গেছে। ফলে বিমান শুধু ফার্স্ট হল না, রেকর্ড মার্কস্ পেয়ে ফার্স্ট। আমি রামাধরকে কমলালেবুর রস করে আনতে বলেছি। হলধর মালা আনতে চলে গেছে। বিমান আমাদের গর্ব, আমাদের গৌরব, আমাদের সৌরভ।'

হঠাৎ স্কুলপ্রাঙ্গণে হইহই করে ঢুকে পড়ল বিশাল এক কীর্তনের

দল। খোল, করতাল, উদ্দাম নৃত্য। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। বিমানস্যারের হেডমাস্টারমশাই অবাক। এ কী কাণ্ড! চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা ভুল করছেন, এটা শ্মশান নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। খঞ্জনি বাজাতে-বাজাতে দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন বিমানস্যারের বাবা। তিনি বৈষ্ণব বিনয়ে সামনে মাথা ঝুলিয়ে, জোড়হাতে বললেন, 'পুত্রের সাফল্যে প্রভুর নামগানই বিধেয়।'

এইসব গল্প স্কুলের মাস্টারমশাইদের মুখে-মুখে ফেরে। সব সময়েই কিছু বাড়ে কিছু কমে। এখন বাঘের কথায় ফেরা যাক। এমারেল্ড সার্কাস। স্যারকে খাতির করে সামনের ভি আই পি আসনে বসিয়েছেন মালিক। ট্রাপিজের খেলা, এক চাকা সাইকেলের খেলা হয়ে গেছে। এইবার বাঘ বেরিয়েছে। রিংমাস্টার টাঁই-টাঁই করে ইলেকট্রিক চাবুক মেঝেতে হাঁকড়াচ্ছেন। সামনে সাত-সাতটা কেঁদো বাঘ, কেউ টুলে, কেউ চেয়ারে, কেউ বেঞ্চে। চাবুকের শব্দে বিশ্রী দাঁত বের করে গর্‌র-গর্‌র শব্দ করছে। তাঁবুর সমস্ত দর্শক ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। সাতটা বাঘ, একা একটা লোক। বাঘেরা ইচ্ছে করলে নিমেষে কিমা করে দেবে। চাপা সুরে বিলিতি বাজনা বাজছে, ট্রাকটাক, ট্রারা ট্রারা। দুটো ক্লাউন সমানে রঙ্গরসিকতা করছে। খেলা বহুত জমেছে।

এমন সময় ঠিক মাঝখানের একটা বাঘ তুড়ুক করে বেঞ্চ থেকে লাফ মেরে নেমে পড়ল। তারপর থুপুক্-থুপুক্ করে স্টেজ পেরিয়ে লাফিয়ে পড়ল দর্শকদের সামনের সারিতে। এ টাইগার, বলে সামনের তিনটে সারির লোক একই সঙ্গে পালাতে গিয়ে পায়ে-পায়ে জড়িয়ে চিতপটাং। গ্যালারির সমস্ত দর্শক ততক্ষণে বাঘের বার্তা পেয়ে মারামারি, গুঁতোগুঁতি করে বেরোবার দরজার দিকে গ্যালারি-ফ্যালারি ভেঙে ছুটছে। বিমানস্যারই কেবল একা স্থির হয়ে সামনের আসনে বসে আছেন। সেটা কোনও সাহসের কথা নয়, ভয়ে পাথর। বাঘ সামনের দিকে খানিক পায়চারি করে বিমানস্যারের দু'হাঁটুর মাঝখানে হাঁড়োল মতো মাথা ঢুকিয়ে কুতুকুতু আদর করতে লাগল। আদরের ঠেলায় তিনি চেয়ার থেকে উলটে ঘাসের উপর পড়ে গেলেন। বাঘটা ইচ্ছে করলেই ডিনারটা সেরে নিতে পারত। তা কিন্তু করল না। বিমানস্যারের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বিশাল একটা হাই তুলে সারের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

সার্কাসের রিংমাস্টার আর অন্য কর্মচারীরা অবাক! কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কুকুরের মতো ব্যবহার করলেও আসলে তো বাঘ। বিমানস্যার এই গল্পটা ছাত্রদের প্রায়ই বলেন। কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যা সে বিচারের প্রয়োজন নেই। গল্পটা বলার জন্য তিনি যে বেঁচে আছেন, এইটাই তো সত্যি। আমাদের মহান হেডমাস্টারমশাই। আসল বাঘ ব্যাঘ্রসম মানুষটিকে চিনতে পেরেছিল। ক্লাসে যখন হুঙ্কার ছাড়েন, অন্য শিক্ষকমশাইরা বলেন, 'রয়েল ওয়েস্টবেঙ্গল ইজ রোরিং।' তারপরেই সমস্বরে সুর করে গেয়ে ওঠেন, 'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।'

সেই বাঘ, সেই সন্ধ্যায় হেডমাস্টার মশাইয়ের বৃদ্ধি থমকে দিলেও এখন যে-অবস্থায় আছেন সেটাও কম কিছু নয়। জমিদার বাড়ির পিলারের মতো। ধুতি, পাঞ্জাবি পরে চেয়ারে বসে আছেন, একাই একশো। ছাত্র, শিক্ষক উভয়েরই প্রিয়। একবার হাসতে শুরু করলে সহসা থামেন না। বর্ষার আকাশে মেঘের গুরুগুরুর মতো।

শিক্ষকমশাইরা হেডমাস্টার মশাইকে মধ্যমণি করে একপাশে বসে আছেন। সামনে লম্বা টেবিল। এপাশে ছাত্রদের বসার জন্য দু'সার চেয়ার। জোড়হাতে শিক্ষকমশাইদের প্রণাম করে আমরা চেয়ারে সভ্য, সংযত হয়ে বসলুম। আমাদের স্কুলে এইসব নিয়ম খুব আছে। লাইন দিয়ে ক্লাসে ঢোকো, ছবির মতো বসে থাকো। লাইন দিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও। হইহল্লা, গুলতানি নট অ্যালাউড। বিদ্যালয়, বিদ্যার আলয়, মানুষ গড়ার মন্দির। প্রতিটি ইট পবিত্র। প্রতিটি ধূলিকণা তীর্থরেণু। আমার বিদ্যালয় বলতে বুক যেন গর্বে দশহাত হয়। চওড়া বুকে দু'হাত রেখে হেডমাস্টারমশাই যখন এইসব কথা বলতে থাকেন, তখন তাঁর দু'চোখে জল চিকচিক করে। আমাদের স্কুল একেবারে ঝকঝকে তকতকে। হেডমাস্টার মশাই বারবার বলেন, "পণ্ডিত অসভ্য চেয়ে মূর্খ সভ্য অনেক ভালো। পড়াশোনা কিছু কম হলেও ক্ষতি কিছু নেই, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল হলেই বিপদ।" তিনি আমাদের কয়েকটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন,

সকালে সূর্যোদয়টা দেখার চেষ্টা করবে।

মানুষের চোখের দিকে সরাসরি তাকাবে।

নতুন বন্ধু করবে; কিন্তু পুরনোদের ভুলবে না।

গোপনীয়তা রাখতে শিখবে।
নিজের ভুল সব সময় স্বীকার করবে।
কাউকে ঠকাবে না।
শোনানোর চেয়ে শুনতে শেখো।
জিনিস চেয়ো না, চাও জ্ঞান আর সাহস।
সোজা হয়ে বসতে শেখো।
গালগল্পে সময় নষ্ট কোরো না।
নোংরা আর আবর্জনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো।
'আমি জানি না' বলতে লজ্জা পেয়ো না।
'আমি দুঃখিত' এই কথাটি বলতে শেখো।

এরপর আর একটি কথা ইংরেজিতে শিখিয়েছেন, ভীষণ সুন্দর,

Trust in God, But Lock Your Car.

বিদেশের ও দেশের কত বড়ো কলেজে অধ্যাপক হওয়ার কত আমন্ত্রণ এসেছে কতবার, হেডস্যার নো করে দিয়েছেন। অসম্ভব! আমি ছোটোদের হাত ধরে বড়ো করব। কী হবে, বিলেতের কলেজে পড়িয়ে! খুব খাতির বাড়বে আমার, ডলার, পাউন্ড, মোটরগাড়ি, ঠাণ্ডা, সুন্দর আবহাওয়া, ছবির মতো রাস্তা, পার্ক। কোনও প্রলোভনই আমাকে কাবু করতে পারবে না। আমার ময়লা টাকাই ভালো। নিজের ঘরের দেওয়ালে, কী সুন্দর লিখে রেখেছেন,

Hold your child's hand every chance you get.
The time will come when he or she won't let you.

মাস্টারমশাইদের সামনের চেয়ারে বসে বেশ ভারিক্কি লাগছে। মনে হচ্ছে বেশ বড়ো হয়ে গেছি। হেডস্যার সকলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, "তোমরা এসেছ, গ্রেট বয়েজ! কীভাবে শুরু করা যায় সভার কার্যক্রম!"

সহপ্রধান বললেন, "ছোট্ট করে একটা ভূমিকা হোক আগে। ভূমিকা ছাড়া ভালো প্রবন্ধ হয় না।"

ইংরেজিরস্যার বললেন, "দ্যাট্স ট্রু।"

হেডস্যার বললেন, "ভূমিকাটা কে করবে?"

"আপনিই করবেন।"

"আপনারা তা হলে কী করবেন?"

"আমরা শুনব।"

"তা হলে শুনুন। মানুষ কী করে হয়?"

"একেবারে অতটা আগে চলে যাবেন! সেই অ্যামিবা থেকে হোমোস্যাপিয়েন্স অনেকটা পথ। কয়েক কোটি বছর।"

"আমি ওটা মিন করিনি। আমি বলতে চাই মানুষের কর্তব্য কী! লিভ ফর আদার্স। অন্যের জন্যে বাঁচা। বলো, জন্ম হইতেই আমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমার আরাধ্য দেবতা স্বামীজির কথার একটি অনুচ্ছেদ উপস্থিত করছি। বসে-বসে হবে না, উঠে দাঁড়াই।"

হেডস্যার উঠে দাঁড়ালেন। চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অন্য মানুষ, "পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশু মৃত প্রেততুল্য; কারণ যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত, প্রেত বই আর কী? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে-কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক, তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে — অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসিবে।"

স্যার ধীরে-ধীরে চেয়ারে বসে পড়লেন। যেন ঘোর লেগে গেছে। সেই ঘোর আমাদেরও লেগেছে। জমাট, ভরাট কণ্ঠস্বর। গং, সিম্ব্যাল, ঘণ্টা, স্যাকসোফোন, সব যেন একসঙ্গে বাজছে। শুনেছি স্বামীজির গলায় এইরকমই ছিল। ঝঙ্কার।

সব স্যার একসঙ্গে বলে উঠলেন, "অনবদ্য, অনবদ্য। ভেরি ইন্‌স্পায়ারিং। সত্যি, কীভাবে আমরা জীবনটা কাটালুম! ঘেন্না করছে, ঘেন্না।"

সহপ্রধান সহসা উঠে দাঁড়ালেন। একবার ঢোক গিয়ে বললেন, "আমিও কিছু যোগ করতে চাই। স্বামীজি আমাতেও এসেছেন — তোরা ভাবছিস — আমরা শিক্ষিত। কী ছাই মাথামুণ্ডু শিখেছিস? কয়েকটি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভেতর পুরে পাস করে ভাবছিস —

আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়োজোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি, এই তো? এতে তোদেরই বা কী হল, আর দেশেরই বা কী হল? একবার চোখ খুলে দ্যাখ.....''

আমার পাশ থেকে বিমান সড়াত করে দাঁড়িয়ে উঠল। সহপ্রধানের মুখের কথা টেনে নিয়ে বলতে লাগল —

''স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কী হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ওই শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর চাকরি-বাকরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কার করে। ওই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যেই আমি লোকগুলোকে রজোগুণতৎপর হতে উপদেশ দিই।''

প্রধানশিক্ষক টেবিলের ওধার থেকে দু'হাত সামনে প্রসারিত করে বলে উঠলেন, ''বুকে আয়, বুকে আয়। তুই বিবেকানন্দ শুধু পড়িসনি। মুখস্থ করে বসে আছিস! অভাবনীয়, অভাবনীয়। আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। এইবার আমরা আমাদের কাজের কথায় আসি। আমাদের পরিকল্পনা, মাস্টারপ্ল্যান। শুধু লেখাপড়া করলেই হবে না, সমাজের কাজে লাগতে হবে। সমাজের উন্নতি করতে হবে। আমি কালিয়া-পোলাও খাব, আর তুমি উপোস করে থাকবে, আমি কলার উলটে স্কুলে যাব, তুমি রাস্তার ধারে ধুলোয় লুটোপুটি খাবে, তা তো হতে পারে না! সকলকে সমান তালে এগোতে হবে। স্বামীজি বলছেন, ''দেশের ইতর সাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।''

সহপ্রধানের ধৈর্য্যচ্যুতি হল। তিনি বললেন, ''কাজের কথায় এলে হয় না!''

প্রধানশিক্ষক বললেন, ''এই তো আপনি ভূমিকার কথা বললেন!''

''যথেষ্ট হয়েছে। এইবার দয়া করে প্রোগ্রামে আসুন।''

''আমরা একটা গ্রামে যাব।''

"কোন গ্রাম?"

"সেটা ঠিক করতে হবে।"

"সেখানে গিয়ে কী করব? পিকনিক?"

"কেন, আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন, মোস্ট রেসপেকটেড স্যার।"

সহপ্রধান একটা ধাক্কা খেয়ে চুপ করে গেলেন। মানুষটি ভীষণ ভালো, তবে ওই, থেকে-থেকে দুষ্ট সরস্বতী মাথায় ভর করে।

প্রধানশিক্ষক ততক্ষণে বলতে শুরু করেছেন, "স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর জীবিকা ও সংস্কৃতি, এই চারটে পিলারের উপর মানুষের জীবনের ছাত ঢালাই করতে হবে। আপনারা সবাই জানেন, ঢালাই কীভাবে হয়! প্রথমে লোহার খাঁচা তৈরি করতে হয়। তারপর পরিমাণমতো বালি, সিমেন্ট, স্টোন চিপ্‌স ও জল মিশিয়ে মসলা তৈরি করে ঢালতে হয়, তারপর পিটতে হয়। লক্ষ করুন, স্টোন নয় স্টোন চিপ্‌স। এই চিপ্‌স হল শিশু। লোহার খাঁচা হল চরিত্র, সিমেন্ট হল আদর্শ, বালি হল সমাজ, আর জল হল স্নেহ, ভালোবাসা, প্রেম, আর পেটাই হল শিক্ষা।"

প্রধানশিক্ষক বাংলার শিক্ষক নির্মলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এইবার আপনি ভাবসম্প্রসারণ করুন। ব্যাপারটাকে যথেষ্ট ফলাও ও বিস্তৃত করুন। আমি একটু বিশ্রাম করি।"

নির্মলবাবু তৎপর মানুষ। তরতর করে পথ চলেন, তরতর করে কথা বলেন। তরতর করে পড়ান। তবে যা পড়ান, সে ভোলার নয়। মনে একেবারে কেটে-কেটে বসে যায়।

কোনওরকম ভণিতা না করেই বলতে লাগলেন, "অশিক্ষিত, নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দিতে হবে। অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি ইত্যাদি।"

অঙ্কের মাস্টারমশাই বললেন, "বাংলার এই এক দোষ। আন-ইকনমিক ইউজ অব ওয়ার্ড্‌স। অপ্রয়োজনে শব্দ ব্যবহার। প্রভৃতিই যদি বলবেন তা হলে আবার ইত্যাদি কেন!"

নির্মলবাবু বললেন, "গাছে একটা পাতা থাকলেই হয় অত পাতা কেন? কারণটা হল শোভা। ভাষা আর ভাববৃক্ষের শোভা হল কথা। অঙ্ক তো কৃপণের শাস্ত্র।"

কুমুদবাবু বললেন, "তা হলে বাড়ান, বাড়িয়ে যান, প্রভৃতি ইত্যাদি, বিভিন্ন, বিবিধ, সমূহ, বাড়িয়ে যান, একেবারে লেজে-গোবরে করে দিন উদার চিত্তে, বদান্য হৃদয়ে।"

নির্মলবাবু বললেন, "আপনাদের সব ভালো, একটাই দোষ, ছোটোখাটো ব্যাপারে নিজেদের জ্ঞান জাহির করা। আপনারা যদি এইরকম করতেই থাকেন, করতেই থাকেন এবং করতেই থাকেন তা হলে এই সভা পণ্ড হয়ে যাবে। অক্ষরপরিচয় বা বর্ণপরিচয়ে আমরা এক জীবন্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। জীবন্ত বর্ণপরিচয়।"

"অর্থাৎ যে শিখবে সে মাস্টারের হাতে মার খেয়ে মৃতপ্রায় হবে না, যেমন আগে পাঠশালায় হত।"

"মহাশয়, ধরেছেন ঠিক। সবাই হেসে-হেসে, নেচে-নেচে, কথাকলির ঢঙে শিখবে অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি খাব পেড়ে। শিক্ষা আর সংস্কৃতিকে আমরা চটকে, যেমন আলুভাতের সঙ্গে পেঁয়াজ, যেমন চিঁড়ের সঙ্গে কলা, যেমন ছানার সঙ্গে চিনি, যেমন....,"

"উপমার আর প্রয়োজন নেই, সম্যক বোধগম্য হয়েছে।"

নির্মলবাবু হাসলেন, তৃপ্তির হাসি। কেউ কিছু বুঝলে তিনি ভীষণ আনন্দ পান। আমরা ণত্ববিধান, ষত্ববিধান শিখতে পেরেছিলুম বলে, তিনি স্কুল কম্পাউন্ডের মেহগনি গাছের তলায় আধঘণ্টা নৃত্য করেছিলেন। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে/তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।।' বলাইবাবু দোতলার জানলা থেকে প্রশ্ন করলেন, "বুড়ো বয়সে এমন বানর নাচের কারণটা কী?"

"দুটো ন, আর তিনটে স-এর মুণ্ডপাত করেছি। পাষণ্ড, পাষাণ তুমি, মুক্ত বৃষ, অকাল কুষ্মাণ্ড। মহিষ না মেষ তুমি? মুষিক? পুরুষ? নাকি ষণ্ড?"

হেডস্যার বললেন, "এইবার আমি এক্সপ্লেন করি; কারণ আইডিয়াটা আমার। এই যে আমার ছেলেরা, এরাই আমার জীবন্ত বর্ণপরিচয়ের বর্ণমালা।"

সঙ্গে-সঙ্গে সহপ্রধান বললেন, "ক্যাপিটাল লেটার, মানে ধেড়ে-ধেড়ে অক্ষর। বোল্ড টাইপ। ক্লাস টু, থ্রি-র ছেলেদের দিয়ে করালে ভালো

করতেন মনে হয়। হয়তো অনধিকার চর্চা হয়ে গেল, তবু বলতে বাধ্য হলুম। কারণ আমি না বলে থাকতে পারি না। এটা আমার চরিত্রের দোষ বলতে পারেন, আবার একটা মহাগুণও বলতে পারেন। অ এগিয়ে আসছে, ঠোঁটে গোঁফের রেখা। অ, আ-র গোঁফ-দাড়ি বেরোতে পারে না, তারা সবসময় শিশু, চিরশিশু।"

"অ, আ কোনওদিন সাবালক হবে না?" প্রশ্ন করলেন অনন্তস্যার। ইতিহাস পড়ান।

"ইতিহাস তো মহাকাল, চিরবৃদ্ধ। ইতিহাসের তো শিশু নেই। জন্মাবেই একশো বছর বয়েস নিয়ে।" নির্মলবাবু বললেন, "ব্যাপারটা আপনাদের মাথাতেই ঢোকেনি। ভালো করে বোঝাই। ধরুন, যেই গানের সুরে বলা হল, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, অমনই একটা ছেলে অজগর সেজে তেড়ে আসবে। যেই বলবেন, আ-এ আমটি খাব পেড়ে, অমনই একটা ছেলে আমগাছ হয়ে স্টেজে এসে দাঁড়াবে।"

কুমুদবাবু বললেন, "ইঁদুর ছানার বেলায় কী হবে? ধরুন শানু ইঁদুর হল। ওই তো ওর সাইজ! ইঁদুরের বাবা কেন, ইঁদুরের ঠাকুর্দারও অতবড়ো সাইজ হবে না।"

ড্রয়িং-এর টিচার বিমলবাবু বললেন, "পারস্পেকটিভটা জানা থাকলে এই প্রশ্ন হত না। মঞ্চে ইঁদুর, তার সাইজটা নেংটির মতো হলে পেছনের সারির দর্শক দেখতে পাবে কিছু! ছবি আঁকার জ্ঞান থাকলে এইসব বাজে প্রশ্ন আসত না, আমাদের সময়ও নষ্ট হত না। আমরা দূরে গেলে ছোটো দেখি, কাছে এলে বড়ো দেখি। আমরা দূরের বাড়ি ছোটো দেখি তার মানে এই নয় যে, দূরের বাড়িটা সত্যিই ছোটো। আর্টের ভাষায় একেই বলে পারস্পেকটিভ।"

"পরস্পরবিরোধী কথা বলে এই ভরদুপুরে মাথাগরম করে দেবেন না মশাই! দূরের বাড়ি, কাছের বাড়ি সবই এক সাইজ, যেমন দূরের ইঁদুর কাছের ইঁদুর দুটোই এক সাইজ। দূর থেকে দেখব বলে, দূরের ইঁদুরটাকে পাম্প করে বড়ো করে দেব? ইজ ইট পসিব্‌ল?"

"তা হলে দেখব কী করে? আচ্ছা মুশকিল তো!"

"কোনও মুশকিল নেই। দূরের ইঁদুর দেখা যায় না, আমরাও দেখব

না।"

"তা হলে, ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে হবে কী করে!"

"তার আমি কী জানি? দ্যাট্‌স ইয়োর প্রবলেম। ইঁদুর দেখা যাবে না বলে একটা হাতিকে ইঁদুর বলে চালাবেন! এইসব তঞ্চকতার মধ্যে আর যেই থাকুক আমি নেই। অ, আ, ক, খ শেখাবার জন্যে এত কাণ্ড করার কী দরকার ! মশা মারতে কামান দাগা!"

"আপনি যদি বুঝতেই পারবেন তা হলে অঙ্কের টিচার হবেন কেন? নীরস সংখ্যা?"

ধুমধাড়াক্কা লেগে যায় আর কী! হেডস্যার উঠে দাঁড়িয়ে জোড়হাতে বলতে লাগলেন, "ফোলডেড হ্যান্ড রিকোয়েস্ট, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। নীরস অ-আ-কে একটু সরস করতে না পারলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা পালাবে। সমাজে কতরকম সর্বনেশে প্রলোভন। দিবারাত্র টিভির ভুটুর-ভুটুর, হিন্দি সিনেমা, বারোয়ারি, মেলা, আড্ডা, বাপ-মায়ের উদাসীনতা, এইসব থেকে ছেলেমেয়েদের বের করে আনতে হবে। মাছ ধরার কায়দা, চার করো, টোপ দাও, মারো টান। দেখেননি, করপোরেশন টিকে দেওয়ার আগে তারস্বরে সিনেমার গান বাজায়। আধুনিক যুগটাই অন্যরকম মাস্টারমশাই। আমাদের কাল কি আর আছে! তবে ওই যে বলেছে, গতস্য শোচনা নাস্তি।"

ইতিহাসেরস্যার অনন্তবাবুকে অনেকটা ইতিহাসের মতোই দেখতে। যেন একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। সমস্ত চুল সাদা, অথচ বয়স খুব একটা বেশি নয়। পায়ে তালতলার চটি। ফাটাফাটা। মোটা ধুতি, হাফ হাতা বাংলা শার্ট, যা একালে কেউ পরে না। চোখে কালো ফ্রেমের পুরু লেন্‌সের চশমা। দেখলেই মনে হয়, চামড়া বাঁধাই একটা সচল ইতিহাসের বই। কেম্‌ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া। লাইব্রেরি-শেল্‌ফ থেকে নেমে এসে স্কুলের করিডর ধরে হাঁটছেন। ইতিহাস বেড়াতে বেরিয়েছে বর্তমানের বাজারে। সবাই বলেন, মানুষটার নলেজ বটে! লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া। স্রেফ সালটা একবার ধরিয়ে দাও, গড়গড়, গড়গড়। বাবর, আকবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গির যেন তাঁর চার ছেলে। ওই যে রে জহিরুদ্দিন বাবর, মাত্র চার বছর ১৫২৬ থেকে ১৫৩০। আমার হুমায়ুন এল। ১৫৩০ থেকে '৫৬। এইবার শুরু হল

আকবরের রাজত্বকাল। গ্রেট জালাজ-উদ-দিন আকবর। ছেলেটা কী ভালোই না ছিল! এদিকে সময় এগোচ্ছে। যেন কালের কপোতাক্ষ ধরে নৌকো এগোচ্ছে। সময়ের ব্যবধানে-ব্যবধানে যাত্রী পালটাচ্ছে। এই আকবর তো, এই জাহাঙ্গির, তো শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব।

সেই অনন্তস্যার চেয়ারে শরীর শিথিল করে বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। আমরাও শুনতে পেলুম সেই ফোঁস। তারপর উদাস গলায় বললেন, "স্যার! সে আমাদের দিন গেছে। সেই সোনার শৈশব! গোল্ডেন বয়হুড ডেজ। কিস্যু ছিল না আমাদের। নো ঐশ্বর্য! কিন্তু কী আনন্দ! একালের শিশুদের এরা যুক্তি করে মেরে দিল! বুলডোজার চালিয়ে শৈশবটা থেঁতলে দিল। পরনে একটা দড়িবাঁধা ইজের। দেড় হাত লম্বা দড়ি সামনে পায়ের ফাঁকে পেণ্ডুলামের মতো দুলছে। গায়ে মোটা কাপড়ের হাফহাতা জামা। ইস্তিরির বালাই নেই। কুঁচকে-মুচকে যেন কলসি থেকে বেরিয়েছে। বুকের বোতাম একটাও নেই। খোলা হাওদাখানা। বুকে লটকে আছে ঢোলকের মতো একটা মাদুলি। তখন সব ছেলেরই আষ্টেপৃষ্ঠে মাদুলি বাঁধা হত। কত রকমের ফাঁড়া। জলে ডোবার, আগুনে পোড়ার, নজর লাগার। আমাদের কোনও লজ্জা ছিল না। পায়ে ফকফকে জুতো। বগলে খানসাতেক ছেঁড়া-ছেঁড়া বই আর বাড়িতে হাতে সেলাই করা খাতা। তখনকার কালে একধরনের শস্তার কাগজ তৈরি হত। লাল, বালি-বালি। ছেলে স্কুলে চলেছে। চান করেছে, চুল তখনও ভিজে। কানের পাশ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বাড়ির পাশেই ইস্কুল, ঘন্টার শব্দ শোনা যায়।

আর এখন! হেডস্যার খেই ধরলেন। "এখন উত্তরের ছেলে স্কুলবাসে দক্ষিণে যায় পড়তে। পাড়ার স্কুলে ছাত্র নেই। মাছি তাড়াচ্ছে। লেখাপড়ার চেয়ে এখন বড়ো হয়েছে স্কুল। নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছেলেমেয়েকে যেভাবেই হোক ভর্তি করতে হবে। ফর্মের জন্যে সাড়ে তিন মাইল লম্বা লাইন। একই সঙ্গে তিনজনের পরীক্ষা, বাবা, মা আর যে ভর্তি হবে। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় বাপ-মায়ের চোখে ঘুম নেই। কী হবে! চান্স পাবে তো! না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আচ্ছা মশাই বলতে পারেন, স্কুল পড়বে, না ছেলে পড়বে।"

কুমুদবাবু বললেন, "সেই কেস তো আমার বাড়িতে চলছে।

নাতনিকে ভর্তি করবে। কলকাতার কাউকে আর ধরতে বাকি নেই। শুধু লাটসাহেবেই বাকি। নাতিটাকে রোজ সাতসকালে তুলে টানতে-টানতে শহরের সেই আর-এক প্রান্তের এক মিশনারি স্কুলে নিয়ে যায়। সকাল হলেই আমার ভয় করে। নিত্য ফাটাফাটি, লাঠালাঠি। এই হল না, ওই হল না। মিস বলেছেন, 'আপনার ছেলে ক্লাসে কিছু করে না, মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। ভীষণ মুডি, লিখতে দিলে পেনসিল চিবোয়।'"

অনন্তবাবু বললেন, "লিখবে কী! আমাদের সময়ে ছিল একটা স্লেট, একটা পেনসিল। বাবা দেগে দিলেন, এ. বি. সি— বুলোও। একদিনেই জেড পর্যন্ত চলে গেলুম। বললেন 'গুড'। মা হাতে ধরিয়ে দিলেন দুটো নারকোল নাড়ু। লাফাতে, লাফাতে মাঠে। চু, কিতকিত। আর এখন? স্পেশ্যাল খাতা। ফুটকি, ফুটকি। কলে কাটা পেনসিল দিয়ে ফুটকি যোগ করো। বিন্দু-বিন্দু এ. বি। আমাদের ছিল দু'টাকা মাইনের বাংলা স্কুল, এখন হয়েছে দু'শো টাকা মাইনের ইংরেজি স্কুল। ছেলেগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে চড়চড়ে রোদে মাঠে বসিয়ে দিলে। কী হচ্ছে ম্যাডাম। নেচার স্টাডি। আকাশ দ্যাখো, শহরের মরামরা, বিবর্ণ গাছ দ্যাখো। চড়াই পাখি দ্যাখো। এদিকে ছেলে বি লিখতে শিখল ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। সব অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। নাও ঠেলা। ছেলের মাকে বলতে গেলুম, 'ও তো সব উলটো শিখছে বউমা।' উত্তর হল, 'অক্ষর নিয়ে কথা, সে ডান থেকে বাঁয়ে আসুক, কি বাঁ থেকে ডানে। কিস্যু এসে যায় না।' মনে-মনে বললুম, 'খুব ভালো কথা, তোমার পাঁঠা তুমি বোঝো, আমার কাঁচকলা। আমরা সব ওল্ড ফুল।' নিজের ছেলেকে বলতে গেলুম, বলল, 'মাথা ঘামাবেন না, শান্তিতে থাকুন।'"

হেডস্যার বললেন, "কাজের কথায় আসা যাক, অনেক বাজে কথা হয়ে গেল। আমরা একটা গ্রাম বেছেছি, নাম হল হাটখোলা।"

অনন্তবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্ন, "এত গ্রাম থাকতে হাটখোলা কেন?"

"দুটো কারণ। প্রথম কারণ, গ্রামটা ব্যাকওয়ার্ড। দ্বিতীয় কারণ, ওখানকার স্কুলের প্রধানশিক্ষক আমার পরিচিত। ওই স্কুল কম্পাউন্ডে আমাদের ক্যাম্প হবে।"

কুমুদবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা কেমন আছে! স্বামীজি তো বলেই গেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। মাছ, মাংস, ডিম্বাদির

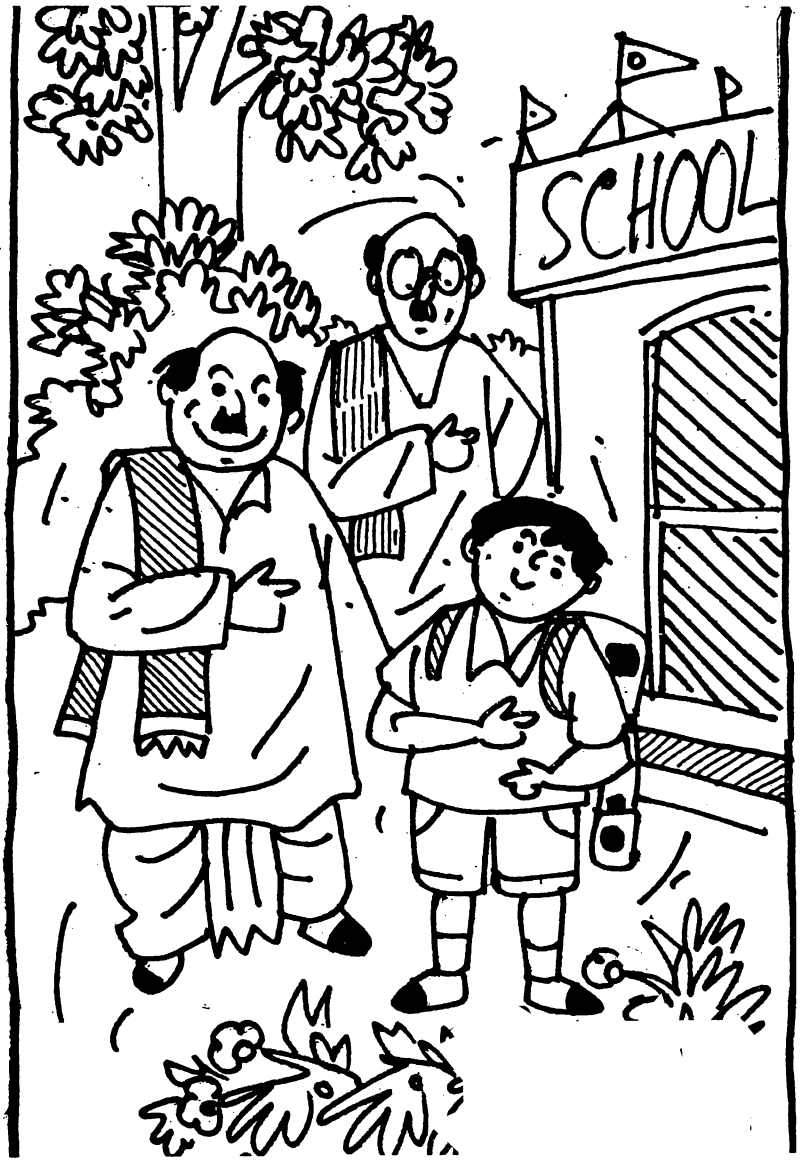
SCHOOL

ব্যবস্থা আছে কি! শুদ্ধ, বিশুদ্ধ প্রোটিন।"

আমরা জানি হেডস্যারও খেতে ভালোবাসেন। আমাদের বাড়িতে কী একটা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তিনি আসায় আমাদের খুব আনন্দ হয়েছিল। প্রাণ খুলে খেয়েছিলেন। ফিশফ্রাই খেয়ে ফেলেছিলেন সাতটা। আটটাই খেতেন। চিংড়ির মালাইকারির জন্য একটু জায়গা রাখতে হল।

হেডস্যার খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন, "অবশ্যই অবশ্যই! স্বামীজি একেবারে সেন্ট-পারসেন্ট কারেক্ট! পেটে আগুন জ্বললে আর কোনও কিছু করা যায়না। মনটা পেটের দিকেই পড়ে থাকে। ওখানে অঢেল খাওয়া। সকালে আমরা শুরু করব মুড়ি আর নারকোল দিয়ে। সঙ্গে গরম-গরম আলুর চপ, বেগুনি। টাটকা, সবুজ কাঁচালঙ্কা।"

"কাঁচালঙ্কা তো শুনেছি লাল হয় মশাই। অবশ্য ভালো করে দেখিনি কোনওদিন।"

"আমিও দেখিনি। রংটা আনইমপর্ট্যান্ট। ইমপর্ট্যান্ট হল ঝাল আর গন্ধ। সঙ্গে থাকবে ছাঁচি পেঁয়াজ। আদা কুচি। চা তো থাকবেই, তবে চায়ের দিকটা একটু উইক হবেই। দুপুরে থাকবে ভাত, ডাল, তরকারি আর রকম-রকম মাছ। ওখানে তো পুকুরের অভাব নেই। জাল ফেললেই এক জাল খলরবলর মাছ। ঘরে পাতা খাঁটি দুধের দই। মিষ্টান্ন। খেয়ে উঠতে না উঠতেই ডাবের মিষ্টি জল। এর পর বিশ্রাম। পাঁচটার সময় চা, সঙ্গে কিছু স্ন্যাক্স। রাতে গরম লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া। শয়নের প্রাক-মুহূর্তে এক গেলাস করে খাঁটি দুধ।"

কুমুদবাবু বললেন, "এইরকমটা যদি ঠিক-ঠিক হয়, আমার আর কিছু বলার নেই।"

অনন্তবাবু বললেন, "সমাজসেবাটা তা হলে কখন হবে?"

"ওই ওরই ফাঁকে-ফাঁকে হবে। আমাদের এইসব সোনারচাঁদ ছেলেরা আছে। হও ধর্মেতে ধীর, হও কর্মেতে বীর, হও উন্নত শির, সাথে আছে ভগবান, নাহি ভয়।"

"কিন্তু মশাই, সমাজসেবার খরচটা আসবে কোথা থেকে! আমাদের স্কুলফাণ্ডের অবস্থা তো তেমন সুবিধের নয়!"

"আরে মশাই, সে-কথাটা কি আমি ভাবিনি! এখন তো স্পনসরের যুগ। ক্রিকেট, স্পনসরার। টিভিতে আপনারা কি প্রায়ই দেখেন না, যে কোনও অনুষ্ঠান হতে-হতে, হেঁচকি তুলে থমকে গেল, দিস পার্ট অব দি প্রোগ্রাম ইজ স্পনসরড বাই, বিড়বিড় করে পাঁচটা কোম্পানির নাম বলে গেল। কলেজে ফেস্ট হবে, দশটা কোম্পানি তেড়ে এল। গানের স্পনসরার একজন, ডিবেট আর একজন। আমাদের এই প্রোগ্রামটা স্পনসর করছে একটা আচার কোম্পানি। তারাই একটা বড়ো বাস দেবে। আমরা আমাদের এই বাহিনী নিয়ে উঠব। সঙ্গে ঝুড়ি, কোদাল। গামবুট, মশা-মারা তেল। ওষুধ-বিষুধ, আমাদেরই প্রাক্তন ছাত্র, ডাক্তার অমিতাভ। আর-এক প্রাক্তন ছাত্র যোগীরাজ তপন। বাসটার গায়ে লেখা থাকবে স্পনসরারের নাম। একটা মিউজিক সিস্টেম থাকবে। থেকে-থেকে গান বাজবে আর ঘোষণা, আচার খাও আচার। জ্যাম খাও, জেলি খাও, নিজে খাও, অন্যকে খাওয়াও। মিস্টি আচার, টক ঝাল, মোরব্বা।"

"যোগীরাজ কী করবে!"

"যোগ শেখাবে। যোগ এখন খুব চলছে! শরীরম আদ্যম খলু ধর্মসাধনম। স্বামীজি বলেছেন, হেলদি মাইন্ড ইন এ হেলদি বডি। শরীর তাগড়া না হলে, এম. এ., বি. এ., টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি কিছুই কিছু নয়। যোগের জন্যে ভোগ, ভোগের জন্যে যোগ। একে বলে সাঁড়াশি আক্রমণ। গ্রামের মানুষকে আমরা এমনভাবে ধরব, পালাবার পথ পাবে না। আমাদের সঙ্গে একটা হারমোনিয়াম থাকবে আর আমাদের সুমন আছে। আমরা গানও শেখাব, সা রে গা মা।"

"সারেগামাটা তো গান নয়, গলা সাধা!"

"না সাধলে গান হয়! আমরা সুরের ছেঁকাটা দিয়ে আসব। দিনান্তে আমরা যখন ফিরে আসব পেছনে ফেলে আসব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিতে জাগ্রত একটি গ্রাম। সা রে গা, অ আ ই, বলো বীর, বলো উন্নত মম শির। টলটলে দিঘি, ঝকঝকে পথ, চকচকে শরীর, মন। এমনই করে গ্রাম, গ্রাম থেকে জেলা, জেলা থেকে শহর, আমাদের কর্মযজ্ঞ ছড়িয়ে পড়বে। এই হবে আমাদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। একের পর এক গ্রাম, একের পর এক শহরের পতন। উড়বে আমাদের বিজয় কেতন।"

"বেশ, তবে তাই হোক।" একবাক্যে সবাই বললেন।

হেডস্যার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা প্রতিভা অনুসারে গ্রুপে ভাগ হয়ে যাও। একভাগ তৈরি করো অ, আ-নৃত্য। অ-এ অজগর আসছে তেড়ে। একটা কাগজের অজগর তৈরি করো। আ-এ আমটি খাব পেড়ে। একটা আমগাছ পিসবোর্ড কেটে, ডালে-ডালে আম তৈরি করে ফ্যালো। ইঁদুরছানা চাই। ঈগল পাখি চাই। উ-এর উট চাই। যারা গান জানো, তারা একটু সুর চড়াও, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি আমি খাব পেড়ে। এই গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের মতো বর্ণমালার নৃত্য চলবে সারা স্টেজে।"

বিমান বলল, "স্যার! একটু ফাইট সিন কি থাকবে?"

"ফাইট?"

"মানে মারামারি স্যার।"

"কে কার সঙ্গে মারামারি করবে?"

"কেন স্যার, অ-কে ধরে পেটালেই আ-বলে শুয়ে পড়বে। তখনই তো মহিলা, পাশে এসে বসে ঈ দিয়ে ঈশ, ঈশ করবে। উ উট হয়ে ঊকে পিঠে চাপিয়ে ঋ-এর ঋষিমশাইকে ডাকতে ছুটবে। গিয়ে দেখবে তিনি ৯-কার হয়ে সাধনা করছেন। এই ৯-কার হবেন যোগীরাজ তপনদা। বিপরীত সলভাসন করলেই ৯-কার। তিনি সব শুনে ও বলে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর ঔ-কার এর ঔষধ নিয়ে ছুটে আসবেন। আ সুস্থ হবে, সঙ্গে-সঙ্গে এ আর ঐ শুরু করবে ব্রেক ডান্স। সবশেষে স্টেজ জুড়ে বর্ণমালার নৃত্য। হইহই ব্যাপার, সঙ্গে মুকুলের গান— লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।"

হেডস্যার অভিভূত হয়ে বললেন, "ছেলেটার মাথা আছে। চেয়ারে বসে-বসে কেমন একটা আধুনিক নাটক লিখে ফেলল। টানটান সঙ্ঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্যাথস। একেই বলে প্রতিভা!"

অঙ্কেরস্যার কুমুদবাবু বললেন, "প্রতিভাটা লিক করে যাচ্ছে স্যার! এবার পাঁচ নম্বর গ্রেস গুঁজে পাস করাতে হয়েছে। ডিস্‌গ্রেসফুল গ্রেস।" বাজারে দেখা হল, ওঁর বাবা বললেন, "মাস্টারমশাই, ছেলেটা আমার বখে গেল, তিন খাতা কবিতা লিখেছে। এদিকে দুই আর দুয়ে চার জানে না।"

"আরে মশাই! সবাই কি আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়, দু-একটা শেক্সপিয়রও হয়ে যায়। এসব ঈশ্বরের খেলা। অনন্তরূপিণী শ্যামা, অন্ত তব কেবা পায়। বলে দিলুম, এই ছেলে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। ইতিহাসে ওর নাম লেখা থাকবে। বিশ্বকোষেও অমর হয়ে থাকবে। দিস ইজ মাই ফোরকাস্ট।"

সভা শেষ। ভেবেছিলুম, ভালো-মন্দ কিছু খাওয়া জুটবে। ঘোড়ার ডিম, কিছুই জুটল না। বেশ ভারিক্কি চালে আমরা বেরিয়ে এলুম হল থেকে। হঠাৎ যেন বয়েস বেড়ে গেছে। কত বড়ো একটা দায়িত্ব ঘাড়ে! অজগর তৈরি করতে হবে। চিনে নববর্ষের দিনে যে কায়দায় চিনেরা ড্রাগন তৈরি করেন, সেই কায়দায় অজগর হবে। ভেতরে তিনটে ছেলে ঢুকবে। তারাই জিনিসটা চালাবে হিজিরবিজির করে। মস্ত একটা ঈগল তৈরি হবে। দুটো ডানায় কায়দা করে কব্জা লাগানো হবে। দড়ি ধরে টানলেই ডানা ঝটপট করবে। এইসব হাতের কাজে তারাপদর খুব প্রতিভা। যখন ট্যাংরায় ছিল, তখন এক চিনা পরিবারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়েছিল। সেইখান থেকে চিনে রান্না, চিনে হাতের কাজ খুব শিখেছে। চিনে পটকা তৈরি করতে পারে। কাগজের শিকলি, লণ্ঠন। আমরা সবাই বলি, তারাপদ দ্য গ্রেট।

আমরা অবিনাশদার দোকানে জিলিপি খেতে ঢুকলুম। বিখ্যাত জিলিপি। দেশ-বিদেশের মানুষ খেতে আসেন গাড়ি চেপে। অনেকদিনের দোকান। শুধু জিলিপি তৈরি হয়। বিশাল কড়ায় রস পাক হচ্ছে। হাত ঘোরানোর কায়দায় জিলিপির বৃত্ত তৈরি হচ্ছে।

জিলিপি খেতে-খেতে তারাপদ বলল, "অ্যায়সা অজগর বানাব লোকে ভয়ে পালাবে। আমাদের কাজ মিটে যাওয়ার পর মিউজিয়মে রাখা হবে। ইঁদুরের পেটে স্প্রিং ভরে দেব, চিঁক-চিঁক করে লাফাবে। ঈগল পাখি শুধু ডানা নয়, ঠোঁটও নাড়বে। ঠকাস-ঠকাস শব্দ হবে।"

মুকুল বলল, "আবহ সঙ্গীত এমন করব, দর্শকের আসনে বসে লোক ধিতিং-ধিতিং নাচবে। হও কর্মেতে বীর, হও ধর্মেতে ধীর, সঙ্গে ঢোল বাজবে, কাড়ানাকাড়া বাজবে। লোকের মুখে-মুখে ঘুরবে হিট হিন্দি গানের মতো।"

আলোচনা করতে-করতে আমরা একেবারে জিলিপির মতো হয়ে গেলুম। ঠাসা রসের বাঁধুনিতে ঘুরপাক। আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভেবে থম মেরে বসে রইলুম। আমরা সবাই কর্মবীর হতে চলেছি। স্বামীজির কত কথা মনে আসছে। দার্জিলিঙের মেঘের মতো ভেসে-ভেসে মনের ঘরে আসছে, আর সব ভাসিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। চারটে লাইন তেড়ে বেরিয়ে এল ঃ

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

বিমান বীরের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "হে ভারত, ভুলিও না — তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না — নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

আমাদের অমন করতে দেখে অবিনাশদা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "তোমাদের কী হল ভাই! আজ তোমরা এত উত্তেজিত কেন? কোনও নাটক-টাটক হবে বুঝি!"

"না গো, আমরা কোমর বেঁধে দেশের কাজে নেমে পড়ছি।"

"তার মানে পার্টি করছ! বোমা, পেটো, পটকা, পাইপ, রামপুরিয়া, ভোজালি, ডাণ্ডা, চেন। যাক, লেখাপড়ার বারোটা। ভালো পথই ধরেছ। এবার আর দেখে কে? সপ্তাহে একটা করে লাশ ফেল। কলকারখানা বন্ধ করে দেশে বেকার বাড়াও। বর্গি এল দেশে, বুলবুলিতে.....।

।। ২।।

আজ আমাদের হাটখোলা যাত্রা। স্পনসরারের দেওয়া বাস এসে গেছে। মাথার উপর বিশাল একটা জ্যামের 'জার' বসানো। পাশে তেরছা হয়ে আছে বিশাল একটা চামচের হাতল। মনে হয় অ্যালুমিনিয়ম দিয়ে তৈরি। রং-এর কী বাহার! ওটা আবার স্পিকার। আচারের গান ছাড়ে থেকে-থেকে। বাসের গায়ে হরেক ছবি আঁকা। ছোটোদের লাল টকটকে আচার খাওয়া মুখ, হুস্, হাস্, ইশ, কী মজা! টক টক, ঝাল ঝাল, মিষ্টি

মিষ্টি।

একপাশে লেখা, সকালের ব্রেকফাস্টে আমাদের জ্যাম, জেলি না থাকলে সকলেই তাঁদের রুটি ছুড়ে ফেলে দেন। সকালের সুর কেটে যায়। এক জায়গায় লেখা আছে, আমাদের চাটনির স্বাদ পরের জন্মেও মনে থাকে।

বাসের সামনে এঞ্জিনের কাছে আমাদের স্কুলের নাম লেখা ব্যানার ঝুলছে। এটা আবার স্পনসর করেছে আমাদের পাড়ার চানাচুর কোম্পানি। মুখরোচক, সুস্বাদু, মুঠো-মুঠো খাও, আনন্দে যাও। ব্যানারে আমাদের স্কুলের নামের তলায় লেখা আছে ঃ সেবা প্রকল্প। জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তার তলায় লেখা, অপারেশন ইল্যুমিনেশন।

একে-একে আমাদের জিনিসপত্র সব উঠছে। ঝুড়ি, কোদাল, নারকোল দড়ি, কাটারি। তারাপদর চিনে কায়দায় তৈরি বিরাট অজগর। ফোল্ড করা যায়, এই একটা সুবিধে। বিকট ঈগলটাকে বাসের ছাতে ফিট করা হয়েছে। আমগাছটাকে নিয়ে সামান্য সমস্যা হয়েছিল। হেডস্যার বললেন, "তারাপদর উচিত ছিল বনসাই করে দেওয়া। যাই হোক, পার্ট বাই পার্ট খুলে গাছটাকে বাসের ছাতেই তোলা হল। একটা কাঠের বাক্সে ছোটোখাটো সব জিনিস। সমস্যা হল উটটাকে নিয়ে। অত বড়ো একটা জন্তু ঢোকে কী করে। থার্মোকল দিয়ে তৈরি। খুবই হালকা; কিন্তু আকৃতিতে মস্ত বড়ো। হেডস্যার বললেন, "দেখা যাচ্ছে, একটা জ্যান্ত উট ভাড়া করলে সমস্যা মিটে যেত। উটটা হেঁটে-হেঁটেই হাটখোলা চলে যেত। পিঠে কিছু জিনিসও নিতে পারত।"

শেষে উট বাতিল হয়ে গেল। নিউ হলের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাজস্থানের কথা ভাবতে লাগল। ড্রয়িং-এর স্যার বিমলবাবু বললেন, "তারাপদর একটাই দোষ, কারও সঙ্গে কোনও কিছু কনসাল্ট করার প্রয়োজন বোধ করে না। সব নিজে করব, সব নিজে করব। পুরো ক্রেডিটটা নিজে নেব। ওই করে মারাদোনা মরল।"

হেডস্যার বললেন, "কথাটা কোন অর্থে বললেন। আপনাকে কনসাল্ট করলে কী হত! উট তো আর ইঁদুর হত না! উট উটই হবে।"

"অমন উষ্ণ কণ্ঠে কথা বলছেন কেন স্যার! আগে শুনুন আমি কী বলছি! আমি হলে বিশাল একটা ক্যানভাসে উট আঁকতুম। তারপর সেটাকে

রোল করে নিয়ে যেতুম যথাস্থানে। সেখানে গিয়ে দেওয়ালে স্ট্রেচ করে দিতুম। উট চলেছে মুখটি তুলে।"

হেডস্যার অভিভূত হয়ে বললেন, "হোয়াট এ মাথা! এই কারণেই আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি মশাই! মানুষের মাথাটাই সব। এ ম্যান উইদাউট হিজ হেড ইজ নো ম্যান। তারাপদ নিজের গোঁয়ার্তুমিতে আমাদের উ-টা শেষ করে দিল।"

বিমলবাবু বললেন, "কিচ্ছু ভাববেন না সার। আমি আছি।"

"আপনি থাকলে কী হবে! আপনি তো উট নন।"

"আমার হাত আছে, চক আছে, ব্ল্যাকবোর্ড আছে। ঝড়াকসে একটানে উট।"

"স্প্লেনডিড, স্প্লেনডিড। একজন প্রকৃত যোদ্ধা আপনি। আপনার তুলনা আমি নই, তিনি নন, আপনার তুলনা আপনিই।"

অনেকক্ষণ ধরে আমাদের গেম-টিচার বিকাশবাবু কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, এইবার সুযোগ পেলেন, "মশাই! আপনার ওই কথাটা তো বুঝলুম না। ঝপ করে বলে দিলেন! আপনার সাবজেক্টও নয়।"

"কোনটা, কোনটা!"

"ওই যে মারাদোনা মরল।"

"ভুল কী বলেছি? অ্যাঁ, ভুল কী বলেছি? নিজেই ড্রিব্‌ল করব, নিজেই গোল করব, নিজেই সব ক্রেডিট নেব, কাউকে পাশ দেব না।"

"আপনি মশাই মারাদোনার মা-ও জানেন না। কোনওদিন সেই বিশ্ববরেণ্য খেলোয়াড়ের খেলা দেখেননি।"

"তার মানে?"

"মানে-টানে জানি না। আপনি অজ্ঞ।"

"আর আপনি খুব বিজ্ঞ!"

ধুমধাড়াক্কা লেগে যায় আর কী! হেডস্যার কোনওরকমে মিটমাট করে দিয়ে বললেন, "একটা কথা সবসময় আপনারা মনে রাখবেন, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। কোথায় মারাদোনা, কোথায় আমরা! চলুন, দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক। ঘড়ি দ্যাখ, ঘড়ি দ্যাখ। সাড়ে

সাত। বাস ছেড়ে দিল। আমরা কোরাসে গেয়ে উঠলুম, আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার। তোমারে করি নমস্কার। এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না কো আর—। তোমারে করি নমস্কার।"

বাসটা অকারণে ভাঁ-ভাঁ করে কয়েকবার হর্ন দিল। বেজে উঠল জ্যাম-জেলির গান। জ্যাম খাও, জেলি খাও, জেলি দিয়ে রুটি খাও, রুটি দিয়ে জ্যাম খাও। রাস্তায় গাড়ির জ্যাম, ঘরে-ঘরে আমাদের জ্যাম। জ্যাম লাগাও, জ্যাম লাগাও।

হেডস্যার, ভুরু কুঁচকে বললেন, "এটা কী ধরনের অসভ্যতা! হোয়াট ইজ দিস! সারাটা রাস্তা যদি এই হয়, সবাই ভাববে আচার কোম্পানি চলেছে।"

ইতিহাসেরস্যার অনন্তবাবু বললেন, "এর জন্যে দায়ী তো আপনিই। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই সব করে ফেললেন!"

"আরে মশাই, পয়সাটা আসবে কোথা থেকে! ইস্কুল ফান্ড তো ভাঁড়ে মা ভবানী। স্পনসরার ছাড়া হত এত বড়ো একটা কাজ!"

"লাউড স্পনসরার না ধরে আপনি সাইলেন্ট স্পনসরার ধরতে পারতেন!"

"কথার কোনও মাথামুণ্ডু নেই, সাইলেন্ট হাঁস, সাইলেন্ট মুরগি, সাইলেন্ট কোলা ব্যাঙ হয়। সাইলেন্ট কামান হয়!"

"তা হলে মরুন। স্বখাত সলিলে ডুবে মরুন। সারাটা পথ জানলা দিয়ে জ্যাম, জেলি, আচার, চাটনি বিক্রি করতে-করতে চলুন। জ্যাম লাগাও, জ্যাম লাগাও। পারলে ছাতে উঠে নৃত্য করুন।"

কুমুদবাবু বললেন, "অকারণে অর্থ খরচের মতো, অকারণে কথা খরচও গর্হিত কাজ। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। দাঁড়ান ইংরেজিতে বলি, থিংস ডান ক্যান নট বি আনডান।"

বাংলারস্যার নির্মলবাবু বললেন, "ছেলেদের ডেকে এইবার বলুন, এটার ভাব সম্প্রসারণ করতে। পঁচিশ নম্বর।"

বাসের ভেতর থেকে হঠাৎ একজন বেরিয়ে এলেন। কোথায় ঘাপটি মেরে এতক্ষণ বসে ছিলেন কে জানে! বিচিত্র তাঁর পোশাক। চিত্র-বিচিত্র ঝলমলে।

HOT
SHO

জ্যাম, জেলি, চাটনির বোতল আঁকা নানা রঙে। ফাঁকে-ফাঁকে মানুষের মুখ। হাসি-হাসি মুখ, হাঁ-করা মুখ। পিঠের দিকে দু'হাতে দুটো চামচে ধরে একজন মানুষের ঊর্ধ্ববাহু নৃত্য।"

লোকটিকে বিরক্তির চোখে দেখতে-দেখতে হেডস্যার প্রশ্ন করলেন, "এই অবতারটি কে? এ তো আমাদের কেউ নয়। কোথা থেকে এর আবির্ভাব?"

"স্যার, আমি কোম্পানির লোক। আপনাদের প্রত্যেকের ডান হাতের উপর দিকে একটা করে আর্মব্যান্ড বেঁধে দেব। কিছুই না, হলুদের উপর লালে লেখা, মুখরোচক আচার, খেয়ে ও খাইয়ে আরাম, প্রস্তুতকারক....।"

"আমরা আচার?"

"আহা, তা কেন? আপনারা হলেন, আমাদের প্রচার মাধ্যম। আচারের বার্তা বহনকারী।"

"একদল....।"

"ছি, ছি, সে কী কথা! আপনারা শিক্ষক। মানুষকে আচার খেতে শেখানোটাও আপনাদের কর্তব্য। স্যার বলেছেন, ওই যে অ-এ আমটি খাব পেড়ে আছে না, বর্ণপরিচয়ে! ওটা বদলাতে হবে। বলতে হবে, আ-এ আচার, খাব মজা করে।"

"অসম্ভব, অসম্ভব! বিদ্যাসাগরকে আমরা বিকৃত করতে পারব না।"

সমস্ত শিক্ষকমশাই একযোগে হইহই করে উঠলেন, "অসম্ভব, অসম্ভব!"

সেই ঝলমলে পোশাকধারী ভদ্রলোক বললেন, "অত হইহই করছেন কেন? যেন মনে হচ্ছে, কোথাও আগুন লেগেছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে বাংলার স্যার নির্মলবাবু অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "হোয়াট ডু ইউ মিন?"

ভদ্রলোক অমায়িক হেসে বললেন, "স্যার, এ-যুগে আমরা সবাই...। তা না হলে কেউ এসব করে! এই আচার বিক্রি, এই সমাজসেবা! রাগ করবেন না, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, তাতে বিদ্যাসাগর বাঁচবেন, আমাদের কোম্পানির মালিক যা চাইছেন, তা-ও হবে। প্রস্তাবটা হল, আ-এ আমের

আচার কুলুঙ্গি থেকে খাব পেড়ে। জিনিসটা ভেবে দেখুন, বিরাট একটা গাছে চড়ে আম পেড়ে খাওয়ার চেয়ে অনেক, অনেক সহজ। ছেলেটা ঘরেই রইল। দুপুরবেলা সবাই ঘুমোচ্ছে, একটা টুল টেনে এনে, তাইতে চড়ে, তাক থেকে শিশি নামিয়ে আচার খাচ্ছে।"

হেডস্যার বললেন, "অরিজিনাল যা আছে, তা আমরা বদলাব না, কিছুতেই না। আর হাতে আমরা ব্যাজ পরব না। আপনার মতো একটা ভাঁড় আমরা সাজতে পারব না। একেবারে ক্লিয়ার কাট কথা।"

"তা হলে আমারও ক্লিয়ার কাট কথা, বাস ফিরে যাচ্ছে।"

সবাই একটু থমকে গেলেন। স্যারেরা দল পাকিয়ে একপাশে সরে গেলেন। অনেক পরামর্শ হল।

হেডস্যার এগিয়ে এসে ভদ্রলোককে বললেন, "ঠিক আছে, আ-টাকে আমরা দু'বার প্রেজেন্ট করব। একবার আম পাড়বে, আর-একবার আমের আচার পাড়বে। তা হলে হবে তো!"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "হবে।"

বাস ছাড়ল। পাড়ার রাস্তা, বাজারের ভিড় ঠেলে অবশেষে বড়ো রাস্তায়।

বাস চলেছে, ড্রাইভারের কেবিন থেকে ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখে বললেন, "আমি কিন্তু মাঝে-মাঝে গাড়িটাকে থামাব স্যার?"

"আপনার এই আবদার কেন স্যার!" বললেন কুমুদবাবু।

"ফর বিজনেস স্যার। দুটো পয়সা রোজগার করতে হবে তো! ড্রাইভারের মাইনে আছে। তেলের দাম আছে। আপনারা তো একটা পয়সাও দেবেন না।"

হেডস্যার বললেন, "আপনার কাছে ক্ষুর আছে?"

"কেন স্যার?"

"আমাদের সবকটাকে ধরে মাথা কামিয়ে দিন।"

"হ্যা, হ্যা, কী যে বলেন স্যার! আপনারা হলেন জাতির মেরুদণ্ড!"

সঙ্গে সঙ্গে গান বেজে উঠল, "শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে খাও, খাও, চেটে খাও, চেখে খাও, চুষে খাও, আচার, আচার বিচার হবে

পরে।"

পাঁচঘরার মোড়ে বাস থেমে গেল। আমরা এরই মধ্যে ভদ্রলোকের নাম রেখে ফেলেছি, 'আচার কুইন'। আচার কুইন নেমে পড়লেন। বাসের পেছন দিকের ডালাটা নামাতেই হয়ে গেল সেলস কাউন্টার। ঘোষণা হতে লাগল, "এক শিশি জ্যামের সঙ্গে একটা ডট-পেন ফ্রি। এক শিশি জেলির সঙ্গে একটা চামচে।"

এইবার একটা কাণ্ড হল, বেজে উঠল হিন্দি গান।

হেডস্যারের মুখটা কেমন হয়ে গেল। সকলের মুখের দিকে করুণ চোখে তাকাচ্ছেন। কুমুদবাবু বললেন, "মান-সম্মানের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও গেল। আর কেন, এইবার চলুন, আমরাও নেমে পড়ে ধিতিং ধিতিং নাচি। ছি ছি, লজ্জায় মাথা হেঁট।"

বিমান আমার কানে-কানে বলল, "চল শানু, লোকটাকে ধরে পেটাই, তারপর যা হয় হবে। আমরা ছাত্র। আমরা কত বড়ো-বড়ো আন্দোলন করেছি, আর এখন চুপ করে যাব! চল, ওঠ।" কথাটা হেডস্যারের কানে গেছে, তিনি মুনি-ঋষির ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন, "আমাদের আদর্শ-বিরোধী কোনও কাজ করবে না। আমি ওই জাম্বুবানকে ডেকে বলছি।"

"এই যে ছোকরা, শোনো।"

তিন লাফে চলে এল সেই জোকার, "বলুন স্যার?"

"আমরা কে?"

"মানুষ, স্যার।"

"কী ধরনের মানুষ? বনমানুষ?"

"এ কী বলছেন স্যার?"

"আমরা শিক্ষক, এটা মানো তো?"

"অবশ্যই।"

"তা হলে তোমার ওই ওলকচু, মানকচু হিন্দি গান বন্ধ করো।"

"আমাকে তো লোক জড়ো করতে হবে! দু'পয়সা কামাই না হলে আমি তো কমিশন পাব না।"

"তোমার আবার কমিশন আছে?"

"থাকবে না! যেখানেই সেল সেইখানেই কমিশন।"

"তোমার টাকা আমি দেব। গান বন্ধ করে গাড়ি ছাড়ো। তোমার কমিশন কত?"

"যা বিক্রি হবে, তার উপর টেন পারসেন্ট। একশো টাকায় দশ টাকা।"

"তোমার কত বিক্রি হতে পারে?"

"ধরুন দশ হাজার টাকা।"

"শয়তানি কোরো না।"

"তা হলে এক হাজার টাকা।"

"এটাও বেশি হল। তা হোক, আমি তোমাকে একশো টাকাই দেব।"

লোকটি ড্রাইভারের কেবিনে ফিরে গেল। গান বন্ধ হল। গাড়ি স্টার্ট নিল। যে সময়ে পৌঁছবার কথা, তার একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা পরে আমরা হাটখোলা পৌঁছলুম। নিস্তারিণী মেমোরিয়াল স্কুল। সব ভোঁ-ভাঁ। মাঠ আছে, বিল্ডিং আছে। মাঠে একটা মনোযোগী গোরু আছে। কোনও মানুষ নেই।

কুমুদবাবু বললেন, "ব্যাপারটা খুব ফিশি মনে হচ্ছে। আমরা আসব জেনেও সব পালাল! ডিচিং।"

হেডস্যার বললেন, "কমিউনিকেশন গ্যাপ। ডাকবিভাগের কল্যাণে চিঠি পৌঁছয়নি।"

"আপনি চিঠি দিয়েছিলেন?"

"মনে হয় দিয়েছিলুম।"

"মনে হয়? শিওর নন?"

"মনে করতে পারছি না। লিখে যে ছিলুম, কোনও সন্দেহ নেই। এখন কথা হল, পোস্ট করেছিলুম কি না!"

নির্মলবাবু বললেন, "ব্যাপারটা জমে গেছে। আমরা তা হলে ফিরে যাই। সমাজকল্যাণ আর করা গেল না। করব বললেই কি আর করা যায়! ভাগ্য সহায় হওয়া চাই।"

বিমান বলল, "স্যার!"

বিমান একটু টেনে-টেনে, নাকিসুরে কথা বলে। "স্যার।"

"বলে ফ্যালো, বলে ফ্যালো। অকারণে বেশি টানাটানি কোরো না।"

"স্যার, আসার সময় বাঁ দিকে একটা পুকুর দেখে এসেছি।"

"বেশ করেছ। চান করতে ইচ্ছে করছে বুঝি?"

"না স্যার! পুকুরটার খুব খারাপ অবস্থা। অসহায় মানুষের মতো। যত আবর্জনা সব ওই পুকুরে। আধখানা প্রায় বুজেই গেছে।"

হেডস্যার লাফিয়ে উঠলেন, "আরে, আমরা তো এইরকমই একটা পুকুর চাই। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। সমাজসেবার প্রধান অঙ্গই হল পুষ্করিণী উদ্ধার। বয়েজ ফরওয়ার্ড মার্চ।"

একটা কিছু করার জন্য আমাদের প্রাণ আকুলিবিকুলি করছিল। মার্চ বলামাত্রই একেবারে মিলিটারি কায়দায় দৌড়। কদম-কদম বাড়ায়ে যা। ঝুড়ি, কোদাল, গাঁইতি, বেলচা। গামবুট আছে সঙ্গে। হেডস্যার বললেন, "এ যা পুকুর, গামবুট পরা যাবে না। বিলিতি পুকুর হলে হত। তোমরা আদুলগায়ে শর্টস পরে নেমে যাও। কোমরে গামছা বেঁধে নাও। পুকুরটা তকতকে, ঝকঝকে হয়ে যাওয়ার পর একটা বোর্ড লাগিয়ে দিয়ে যাব। এই পুকুর সংস্কার করা হল। তলায় আমাদের সমিতির নাম।"

"আপনি এত নামের কাঙাল কেন? হোয়াট ইজ ইন এ নেম!" নির্মলবাবু বললেন, সঙ্গে জুড়ে দিলেন স্বামীজির উক্তি — "শুনুন, স্বামীজি সিস্টারকে একটা চিঠিতে লিখছেন, 'ভালই হোক আর মন্দই হোক, আমরা সকলেই এ সংসারে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করে যাচ্ছি। যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব, তখন এ-সব বিষয়ে আমরা শুধু প্রাণ খুলে হাসব।'"

"অন্তত এই ব্যাপারে আপনি যদি কিছু না বলেন, আমি একটু খুশি হব। কোথায় স্বামীজি আর কোথায় আপনি! আকাশ আর পাতাল, চাঁদ আর চাঁদমালা। আপনার বাড়ির বাইরে আপনার নামের ফলক। ইয়া গোটা-গোটা অক্ষর। আপনার নামের প্যাড। কত কথাই তাতে লেখা। এমনকী এ-

কথাও লেখা, প্রাক্তন সভাপতি, বাঁশতলা মিলনী সঙ্ঘ। নামটা যেন সংবাদপত্রের ভাষায় স্ক্রিমিং হেডলাইন। এপাশ থেকে ওপাশ। কবে একটা বই লিখেছিলেন, সে-কথা আজও যাকে পান তাকেই শোনান। ক' কপি বিক্রি হয়েছিল মশাই!"

অঙ্কেরস্যার কুমুদবাবু খুব উত্তেজনার মুহূর্তে সাঁ করে নস্যি টানেন, আর এই শব্দটাই হেডস্যার ভীষণ অপছন্দ করেন। শব্দ শুনে হেডস্যার ভুরু কুঁচকে তাকলেন। কুমুদস্যার পাত্তাই দিলেন না। হাতের টিপে তখনও সামান্য নস্যি। সমানে একটু কুঁজো হয়ে, নাচের মুদ্রায় ধরা সেই আঙুল দুটোকে বুকের কাছে তুলে এগিয়ে আনতে-আনতে নাকিসুরে বললেন, "এই ঝগড়া, কাজিয়া, পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ, দেশের, সমাজের, জাতির এবং ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকারক। এতে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হয়। শাস্ত্র বলছেন, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। ধপাস করিয়া পতন।"

নস্যির কারণে হেডস্যার একটু বিরক্তই ছিলেন। আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, "শুনুন মশাই, উদ্ধৃতি যখন দেবেন, তখন সঠিক উদ্ধৃতিই দেবেন। ডোন্ট ফরগেট, ইউ আর এ শিক্ষক। জন ডিকিনসনের, দ্য লিবার্টি সং-এ দুটো লাইন আছে, Then join hand in hand, brave Americans all/ By uniting we stand, by dividing we fall."

"এ আবার আপনি কবে পড়লেন! জন ডিকিনসন? তিনি আবার কে!"

"১৭৩২ সালের আমেরিকান কবি। আপনাদের পদে-পদে ভুল ধরার জন্যে আমাকে এইসব পড়তে হয়।"

নির্মল স্যার ঝগড়া ভুলে, হেডস্যারকে সমর্থন করে বললেন, "ঠিক বলেছেন সার। আমাদের কুমুদবাবু অঙ্কশাস্ত্রটা খুব ভালো জানলেও লিটারেচারে ভীষণ, ভীষণ উইক। মাঝে-মাঝেই বলতে শুনি, তোদের ব্যাংলার টিচার! বর্ষাকালে ব্যাঙ ডাকে আর বাংলার টিচাররা কবিতা আবৃত্তি করেন। অঙ্কের অহঙ্কারে লঘু-গুরু জ্ঞান হারিয়েছেন। উনি ভুল ইংরেজিতে যে-কথা বলেছেন, আমি সংস্কৃতে প্রায় সেই কথাটাই বলব, তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

নির্মল স্যার বীরের মতো হাসছেন। এমন একটা কিছু বলেছেন,

যেন একেবারে তুরুপের তাস খেলা।

হেডস্যার ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী বিচ্ছিরি কথা! আড়াই হাত লম্বা। রেফের ছড়াছড়ি। সংস্কৃতের এই খোঁচাটা মশাই আমার অসহ্য লাগে। একটার ঘাড়ে আর-একটা শব্দ চাপিয়ে যেন একটা ....। একেবারে ঠাসা, গাদাগাদি, পলিউশান, সাফোকেশান, একটার কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর-একটার নাকে।"

"আপনার সেইরকম মনে হলে আমার কিছু করার নেই। দেবভাষা।"

"জট ছাড়ালে, মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে?"

"অতি সুন্দর। অনেক তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়।"

"বাঃ বাঃ, অতিশয় সুন্দর। ওইটুকুর মধ্যে এতটা ঢুকে আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক প্যাকিং।"

এইসব ঘ্যাঁচোর-ম্যাঁচোর যখন হচ্ছে, ততক্ষণে আমরা সেই ডোবায় নেমে পড়েছি। হাতে আর পায়ে কেরোসিন তেল মেখে নিয়েছি। ভুরভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে বিকট। ব্যাঙাচি আর নানা রকমের পোকা লাফিয়ে-লাফিয়ে গায়ে উঠছে। জলমাকড়সা লম্বা-লম্বা ঠ্যাং নিয়ে পিঠ বেয়ে ঘাড়ের কাছে উঠে গিয়ে কাঁধে ডান্স করছে। তবু আমরা নির্ভীক। ডু ইয়োর ডিউটি কাম হোয়াট মে।"

সাইকেলে চেপে ভীম ভবানী মার্কা একজন ভদ্রলোক এলেন কোথা থেকে। স্ক্রু কাট চুল। ইয়া গর্দান। আধুনিক মাস্তানি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী! কী হচ্ছে এখানে?"

উত্তর দিলেন হেডস্যার, "আমরা একটা সামাজিক কর্তব্য পালন করছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে নির্মল স্যার যোগ করলেন, "স্বামীজি বলছেন, বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ, অর্থাৎ, বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করো। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালেনর কল্যাণ করা— এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।"

ভীম ভবানী বললেন, "লেকচার রাখুন। আসল ব্যাপারটা কী!

কোথাকার লোক আপনারা!"

"আমরা কলকাতার দিক থেকেই আসছি। স্বামীজির অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। দেশের, দশের কল্যাণে ব্রতী। ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ অর্থাৎ ত্রিভুবনের হিত করিতে আমরা ভালোবাসি।'

"হয়েছে, হয়েছে। আসল কাজটা কী হচ্ছে!"

"পুষ্করিণী উদ্ধার।"

"ঝেড়ে কাসুন তো, আপনারা হালদারের লোক। তাই তো!"

"কে হালদার!"

"দেখাচ্ছি, কে হালদার! দাওয়াই পড়লেই সব বেরিয়ে আসবে।"

লোকটি আধচক্কর মেরে যেদিক থেকে এসেছিলেন সেই দিকেই চলে গেলেন। আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি নন-স্টপ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ....

মাস্টারমশাইরা ছায়ায় বসে আছেন। কুমুদস্যার মাঝে-মাঝেই বলছেন, "এক চুমুক চা যদি এই সময় পাওয়া যেত!"

গোটা দুয়েক মোটর সাইকেল আসছে। ঘোর শব্দ। খুব স্পিডে আসছে। বাইক দুটো আমাদেরই দঙ্গলে এসে থামল।

কুমুদস্যার বললেন, "চা এনেছেন বুঝি!"

ভীষণ চেহারার চারজন মানুষ। কর্কশ গলা, "এই উঠে আয় বদমাশের দল। এই কাজ তোদের কে করতে বলেছে? হালদার!"

হেডস্যার এগিয়ে গেলেন, "তখন থেকে আপনারা হালদার, হালদার করছেন। হালদারমশাই কে?"

"কিছুই জানেন না বুঝি! যত্ত সব! হালদার হলেন গিয়ে হেডমাস্টার!"

"অ, পবিত্রবাবু! পবিত্র হালদার! তিনি কোথায়! তাঁর সঙ্গেই তো কথা হয়েছিল।"

'তাঁকে তো আমরা কিছুদিনের জন্যে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। বেশি না, মাথার দশটা স্টিচ, আর বুকের একটা কাঁপ মচকে দিয়েছে আমাদের ছেলেরা। বাঁ চোখটা ঢেকে দিয়েছে। এদিকটা মেরামত হতে-হতে ওদিকটা

খুলে যাবে। সেই হালদার বলেছে তো এটাকে সাফ করতে!"

"আজ্ঞে না, শুধু-শুধু একজন অসুস্থ মানুষের নামে কেন মিথ্যে কথা বলব। আমরা সবাই একটা স্কুলের শিক্ষক। আমাদের বাসনা হয়েছিল, সমাজসেবা করব। পবিত্র আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। পবিত্র বলেছিল, 'আমার এখানে আয় করার মতো অনেক কাজ আছে।' তাই আমরা নানাভাবে তৈরি হয়ে, একজন স্পনসরার জোগাড় করে এখানে এলুম। এসে দেখছি, সব ভোঁ-ভোঁ, কেউ কোথাও নেই। তখন আমরা নিজেরাই ঠিক করলুম, সমাজসেবার একটা প্রাচীন দিক হল পুষ্করিণী সংস্কার। তা সেই কাজেই ছেলেদের লাগিয়ে দিলুম। এত আয়োজন করে এসে শুধু-শুধু ফিরে যাব! পুকুরটার অবস্থা দেখেছেন? একেবারে দূষিত হয়ে আছে। এর থেকেই ম্যালেরিয়া, এর থেকেই কলেরা, যাবতীয় মহামারীর প্রকোপ। কত বড়ো একটা ভাল কাজে আমরা হাত দিয়েছি! অ্যাপ্রিসিয়েট করুন। ঈশ্বরের অসীম কৃপা! এই রকম হাতের কাছেই একটা পুকুর সাজিয়ে রেখেছেন!"

"খুব ভালো কাজ করেছেন! আরে মশাই, এই পুকুরটা আমরা একটু-একটু করে বোজাচ্ছি। এটা আমদের জবরদখল। হালদারদের সম্পত্তি। আমরা এটাকে বুজিয়ে পল্লীমঙ্গল ক্লাব করব।

হেডস্যার লাফিয়ে উঠলেন, "মঙ্গল! মঙ্গল শব্দটা আছে! সে তো ভালো কথা! তা কী, কী মঙ্গল করবেন!"

"একটা ক্লাবঘর হবে। সেখানে ক্যারমবোর্ড, তাস, দাবা, টিভি থাকবে। ছেলেরা আসবে, খেলবে। সারারাত ভিডিও প্রোগ্রাম দেখবে। ইলেকশানের সময় আমাদের হয়ে কাজ করবে। মিছিলের দিন গ্রামের লোককে ঝেঁটিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাবে। এখানকার লোকের বেচাল দেখলেই চেন আর ডাণ্ডা বের করে ঠাণ্ডা করে দেবে। অন্য মতের, মানে বেপাড়ার লোক দেখলেই দলবেঁধে তেড়ে যাবে।"

"আর কিছু করবে না! মহাপুরুষদের জন্মদিন পালন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজি!"

"ওঁরা আবার কবে মহাপুরুষ হলেন? আমাদের কোনও মহাপুরুষই স্বদেশী নন, বিদেশি। ওই একটা ব্যাপারে আমরা খুবই উদার।"

"আমরা এখন তা হলে কী করব?"

"কী করবেন? আধুনিক কায়দায় সমাজসেবা! একালে লোকে পুকুর কাটে না। পুকুর বোজায়। আপনাদের কলকাতায় কী হচ্ছে, পুকুর ভরাট করে বড়ো-বড়ো ফ্ল্যাট। এতক্ষণ আপনারা পুরাণ মতে সমাজসেবা করলেন। এইবার উল্টপুরাণ মতে করুন। ছেলেদের বলুন, যা তুলেছে আবার সব ওই পুকুরে ফেলতে। তারপর, দয়া করে এসেছেন যখন, তখন গোটাটাই ভরাট করে দিয়ে যান। প্রথমটা তো পাকা ঘুঁটি কাঁচা করা হল। ওটা হল পুরনো পড়া, নতুন পড়া হল, ওই যে দেখছেন ডাঙাটা, ওখান থেকে মাটি কেটে এনে এই পুকুরে ফেলতে বলুন। যদি না করেন তা হলে কী হবে?'

হেডস্যার বললেন, "কী হবে?"

"আপনাদের অল্পবিস্তর শরীর খারাপ হবে। আমাদের নানা রকম ব্যবস্থা আছে, একমাসের জন্যে, তিন মাসের জন্যে, এক বছরের জন্যে, যাবজ্জীবনও আছে। শুয়েই রইলেন, আর উঠতে হল না। আর কাজটা যদি করেন, তা হলে, আমরা এখনই চায়ের ব্যবস্থা করব। দুপুরে ভাত, ডাল, তরকারি, পুকুরের মাছ খাওয়াব। দই খাওয়াব। বিকেলে আবার চা। অতিথি আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি হবে না। আপনারা কিন্তু সমাজ সেবাই করছেন। গঠনমূলক সমাজসেবা। এতকাল সবাই কেটে এসেছে। মাটি হল মা। মাকে কেটেছে, গর্ত করেছে, চোট দিয়েছে। পাপ করেছে। আপনারা সেই গর্ত বুজিয়ে পুরনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। আমরা এখন কী বলছি বলুন তো— কাটতে হলে মানুষ কাটো, গাছ কোটো না।"

হেড্স্যার বললেন, একটু আমতা-আমতা করে, "গোটা পুকুরটা কি ভরাট করা যাবে বাবা?"

"যতটা হয়, যতটা হয়। আমরা অন্যায্য কথা বলব কেন!"

"আমরা তো শুধু পুকুরের জন্যে আসিনি বাবা, আমরা যে আবার সাক্ষরতার কর্মসূচি নিয়ে এসেছি। একঘন্টায় অ, আ, ক, খ। সরকার যেমন চাইছেন আর কী!"

"বাঃ বাঃ, সে তো বহত আচ্ছা!"

নির্মলস্যার নীরবতা ভেঙে বললেন, "ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ।' স্বামীজি বলছেন, 'এদিকে জ্যান্ত

ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। মুম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে। শিক্ষা, শিক্ষা, ফার্স্ট ওয়ার্ড অ্যান্ড লাস্ট ওয়ার্ড।"

কুমুদস্যার এই উত্তেজনার শেষ মুহূর্তে হাতে ধরা নস্যির শেষ টিপ নাকের কাছে ধরে মোক্ষম একটা টান মারলেন। যেন সাইরেন বাজল। ব্রহ্মরন্ধ্র বার্স্ট করে আর কী।

পাড়ার দাদা নির্মলস্যারের বক্তৃতায় বেশ খুশি হলেন। হুমদো মুখে হাসি ফুটল। কুমুদস্যারের নস্যির টানও মনে হয় মনে ধরেছে। আমরা যে প্রকৃত সমাজসেবী, আমাদের আর কোনও ধান্দা নেই এটা বুঝেছেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছেলেরা উঠে এসো, আর নোংরা ঘাঁটতে হবে না। ওপাশে একটা বড়ো দিঘি আছে, সাবান মেখে চান করে এসো!"

হেডস্যার বললেন, "সে কী, এটা ভরাট করতে হবে না?"

"সে আমার ছেলেরা করবে! এ-কাজ ওদের নয়। আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা হালদারের লোক নন। আপনারা জেনুইন সমাজসেবী। ভালো মানুষ, এক নম্বর মানুষ। আপনারা সেবা করবেন অন্যভাবে। শীতলাতলায় স্বাক্ষরতার ক্যাম্প হয়েছে। সেইখানে চলুন। দেখি আপনারা কী এনেছেন! ও হ্যাঁ, আপনাদের রক্ত দিতে হবে।"

হেডস্যার বললেন, "এই যে বললেন, আমরা ভালো লোক। রক্ত-টক্ত দিতে হবে না!"

"এ রক্ত সে রক্ত নয় স্যার। আমাদের ব্লাড-ডোনেশান ক্যাম্প হয়েছে। রক্ত চাই, রক্ত। বোতল-বোতল রক্ত। আমাদের টার্গেট দু'শো বোতল।"

শীতলাতলা জায়গাটা বেশ ভালো। বিরাট মাঠ। চারপাশে বড়ো-বড়ো গাছ, ছায়া করে রেখেছে। মন্দিরটা বেশ বড়ো। বিশাল মায়ের মূর্তি। একটা মঞ্চ করা হয়েছে। শীতলাবাড়ির একটা ঘরে সার-সার বেড। এক-একবার ছ'জন রক্ত দিতে পারবে। হিন্দি গান বাজছে। হঠাৎ গান থামিয়ে আহ্বান, "বন্ধুগণ, রক্ত দিন। আপনার রক্তে মুমূর্ষু প্রাণ ফিরে পাবে। নেতাজি একদিন নেশনকে বলেছিলেন 'গিভ মি ব্লাড আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম,' আহা আহা, রামজি ভাবিকো বাধাই — রক্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে। শাস্ত্রে আছে রক্তবীজের ঝাড়। আহা, আহা,

রামজি।"

গান আর বক্তৃতা, বক্তৃতা আর গান। মাঝে-মাঝে আবার হ্যালো, হ্যালো, টেস্টিং টেস্টিং, নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স। একটি ঘোষণা, একটি ঘোষণা। এইমাত্র কলকাতা থেকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছেন বনমালী বয়েজ স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ। স্বামীজির অনুপ্রেরণায় প্রাণিত। সেই স্বামীজি, যাঁর শিকাগো হল এই সেদিন। যিনি বলেছিলেন, যিনি বলেছিলেন, যিনি বলেছিলেন ..... নির্মলস্যার লাফিয়ে উঠলেন, "আটকে গেছে, সাপ্লাই লাইনে আমার থাকা দরকার।" মঞ্চের দিকে এগোচ্ছেন। গান শুরু হয়ে গেছে, "বাহা, বাহা, রামজি।"

হেডস্যার নির্মলসারকে আটকাতে চেষ্টা করলেন। তিনি ঝটকা মেরে সোজা মঞ্চে, মাইক্রোফোনের সামনে। গানটা চাপা পড়ে গেল। তিনি বলছেন, "স্বামীজি বলেছিলেন, 'তোমরা সিংহতুল্য হবে। ভারতকে — সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। এ না করলে চলবে না, কাপুরুষতা চলবে না বুঝলে। কার্যসিদ্ধির জন্যে আমাদের ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন কেবল কাজ, কাজ, কাজ। ধৈর্য, অধ্যবসায় ও পবিত্রতা চাই।'"

কুমুদস্যার কেবলই বলছেন, "পরিবেশটা ঠিক আমাদের উপযোগী নয়। হিন্দি সিনেমার গানের সঙ্গে স্বামীজিকে পাঞ্চ করছে। আমাদের মশাই বয়েস হয়েছে। আমাদের কালচারের সঙ্গে মিলছে না।"

পুকুর-ধারে যে তম্বি করছিল, তার নাম জেনেছি শীতল। আমরা দাদা বলতে শুরু করেছি। সেই শীতলদা কুমুদসারের কথা শুনে ফোঁস করে উঠল, "স্বামীজি কী কেবল আপনাদের সম্পত্তি! আপনাদের স্কুলের ওই আদুরে খোকাদের চেয়ে আমরা অনেক ভালো। ওরা তো স্বার্থপর হবে। নাকতোলা হবে। বড়ো-বড়ো ফ্ল্যাটে থাকবে, বড়ো-বড়ো কথা বলবে। একালে এইভাবেই ওদের তৈরি করা হচ্ছে। ঘরে-ঘরে ইংলিশ মিডিয়াম। জ্যাক অ্যান্ড জিল লাফাচ্ছে। স্বামীজিকে আমিও গিলে খেয়েছি। মনে আছে, তিনি কী বলেছিলেন, 'তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের —নিজের ব্যক্তিসুখের জন্য নহে; ভুলিও না— তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না — তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র;

ভুলিও না — নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল — আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল, ভাই — ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

চা এসে গেছে। শীতলদা নিজেকে সংযত করে বলল, "নিন মাস্টারমাইরা, চা খান। সঙ্গে গরম নিমকি আছে।" হেডস্যার খাবেন কী! তিনি তো অভিভূত! চোখে জল। তাঁর এইরকম হয়। খারাপ হলে কাঁদেন না। গুম মেরে যান। ভালো হলেই চোখে জল।

শীতলদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "জেম অব এ বয়। জেম অব এ বয়।"

আচারদাদা হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, গাঁক-গাঁক করে আচারের গান বাজাতে শুরু করেছেন। দু'চারটে লোক দেখলেই তাঁর বিক্রির ধান্দা। গান হচ্ছে, খাও আচার, খাওয়াও আচার। জিভে জল, মনে বল, খাও আচার, কেন বিচার, যাবজ্জীবন এই আচার।"

শীতলদার ভুরু কোঁচকাল, "এটা কী!"

কুমুদস্যার বললেন, "ওই যে, আমাদের স্পনসরার। আচার কোম্পানি। জ্যাম, জেলি, চাটনি। সারাটা পথ এই করতে-করতে এসেছে। একবার করে থামে, গান বাজায়, বিক্রি করে, আবার চলে।"

"গাড়িতে জিনিস আছে?"

"প্রচুর।"

"দেখছি।"

আমাদের চা দিয়ে শীতলদা মঞ্চে চলে গেল। নির্মলস্যার নেমে চলে এসেছেন আমাদের কাছে। শীতলদা মাইকের সামনে, "হ্যালো, হ্যালো, বন্ধুগণ অত্যন্ত সুখবর, যারা রক্ত দিচ্ছে তাদের প্রত্যেককে বিনামূল্যে, পুরস্কার

হিসেবে, এক শিশি জ্যাম, জেলি অথবা চাটনি দেওয়া হবে। কলকাতার বিখ্যাত আচার কোম্পানি টেস্ট অ্যান্ড ডান্স আমাদের এই উপহার পাঠিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞ।"

আচারদাদা গাড়ির ভেতরে। সেইখান থেকে মাইকে বলছেন, "এই না, এ কী হচ্ছে। মরে যাব। ফ্রি নয়, ফ্রি নয়। পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। বাজারের চেয়ে কম দাম। ফ্রি হল চামচে। ওয়ান স্পুন ফ্রি।"

শীতলদার আবার ঘোষণা, "যাঁদের রক্ত দেওয়া হয়ে গেছে, তাঁরা গাড়ির কাছে চলে যান। পুরস্কার বুঝে নিন। গোলমাল করলে জানান। আমাদের দাওয়াই প্রস্তুত আছে।"

এইবার শীতলদাদের গান বাজছে, আর হিন্দি নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত — আকাশভরা সূর্যতারা। মাঠের মাঝখানে দু'হাত তুলে আচারদাদা নাচছেন। শীতলদার ছেলেরা পেটি-পেটি জিনিস নামাচ্ছে আর দু'হাতে বিলি করছে। ওদিকে মাঠ-ময়দান ভেঙে মানুষ আসছে আচারের লোভে। একটি ছেলে মাইকে গাইছে, "রক্ত দে দো, জ্যাম লে লো।" আবার আকাশভরা।

কেস খুব জমে গেছে।

ঠিক দুটোর সময় রক্তদান শেষ হল। মন্দিরের পেছনে রান্না হচ্ছিল। শীতলদা খুব আপ্যায়ন করে খাওয়াল। লেখাপড়া জানা ছেলে। এম. এ পাস। প্রকৃত সমাজসেবী। আমরা খেতে-খেতেই শুনছি ঘোষণা হচ্ছে — "তিনটের সময় আমাদের ময়দানে শুরু হবে বর্ণপরিচয় নাটক। কলকাতার বিখ্যাত স্কুল বনমালী বয়েজের ছাত্র ও শিক্ষকরা এসে গেছেন তাঁদের বর্ণাঢ্য পালা নিয়ে। দু'ঘন্টায় অ আ ক খ শেখা হয়ে যাবে। মায়েদের অনুরোধ ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিন। নিজেরাও আসতে পারেন। অভিনব এই পালায় গান আছে, ছড়া আছে, বর্ণমালার নৃত্য আছে, লড়াই আছে। আসুন, আসুন, চলে আসুন। সাক্ষরতার এই কর্মসূচিকে সফল করুন। নাটকের শেষে আছে যোগ। যোগীরাজ তপন তাঁর যোগপ্রদর্শন করবেন। তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসেছেন। তিনি কাচের বোতল, আলপিন, পেরেক, লোহার টুকরো সবই খেতে পারেন, জ্যান্ত মুরগি গিলে ফেলেন।"

তপনদা আমাদের পাশে বসেই মাছের মুড়ো খাচ্ছিলেন, সেই অবস্থাতেই মঞ্চের কাছে ছুটে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, "কী সর্বনাশ,

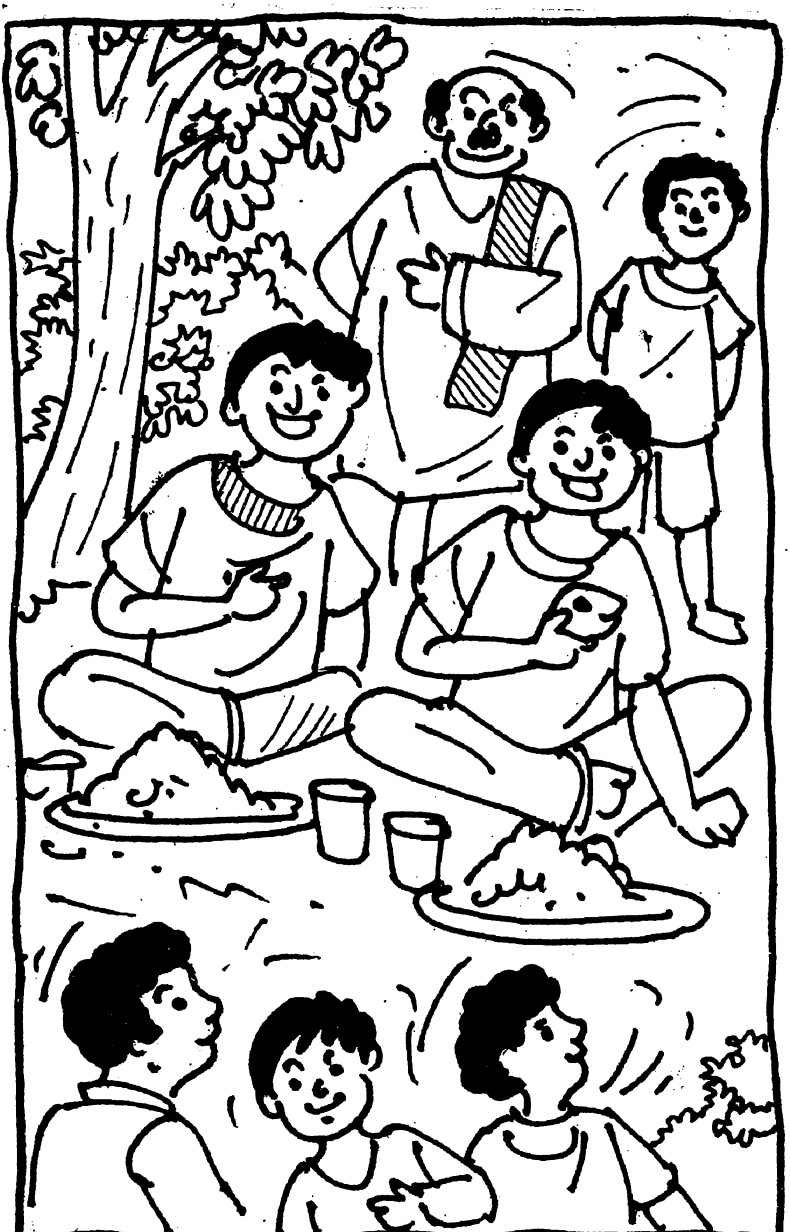

কী সর্বনাশ, ওসব নয়, ওসব নয়। আমার যোগ অন্য, যোগাসন, যোগাসন।"

ঘোষক তখন অন্য লাইনে চলে গেছেন, তিনি টোপ ফেলছেন, "অনুষ্ঠানের শেষে বিনামূল্যে চামচে বিতরণ করা হবে। এই চামচে দিচ্ছেন কলকাতার বিখ্যাত আচার কোম্পানি — টেস্ট অ্যান্ড ডান্স।"

একটা মানুষ যে দু'ঘন্টার মধ্যে এমন রোগা হয়ে যেতে পারে, আমাদের আচারদাদাকে না দেখলে বিশ্বাস হত না। শুনেছি ফাঁসির আসামির রাতারাতি সব চুল পেকে যায়। আচারদাদার মুখটা এতটুকু হয়ে গেছে। শুকিয়ে আমসি। কোমর থেকে প্যান্টুল ঝুলে-ঝুলে পড়ছে। চোখ দুটো মরা মাছের মতো। শীতলদাকে বলতে গিয়েছিল, "ধনেপ্রাণে মারবেন না স্যার!"

শীতলদা বলল, "ধনে মারলে আর প্রাণে মারব কেন?"

সাড়ে তিনটের সময় আমরা সব সেজেগুজে মঞ্চে উঠলুম। কুমুদস্যার এত খেয়েছেন যে, থেকে-থেকেই শুয়ে পড়তে চাইছেন। মাঝে মাঝেই হাই তুলছেন সুন্দরবনের বাঘের মতো। অনন্ত বার চারেক বলেছেন, "আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে। এই তো শীতল, এই তো সেই ছেলে।"

স্টেজ সাজানো হয়ে গেছে। তারাপদ একপাশে আমগাছের কাট আউট খাড়া করে বসে আছে। গাছের তলায় ছোটোমতো প্লাস্টিকের একটা ঝুড়ি। আমগাছের ডালে-ডালে হিসেব করে দশটা কাঁচা আম বেঁধেবুঁধে কোনওক্রমে ঝোলানো হয়েছে। শুধু আ শিখলে হবে না। কুমুদস্যার সঙ্গে-সঙ্গে কাউন্টিং-ও শেখাবেন। কম্বাইন্ড কোর্স। ছেলেরা বলে-বলে আম পাড়বে, এক, দুই, তিন। গোনাটাও শিখে যাবে। ঝুড়ি থেকে আম তুলে-তুলে একজন আর-একজনকে দেবে, আর কুমুদস্যার প্রশ্ন করবেন, "ক'টা পেলে? ক'টা হল?"

•

আমি এদিকে অজগরে ফিট হয়ে গেছি। গেমটিচার বিকাশস্যার নিজেই ঈগলের দায়িত্ব নিয়েছেন। বন্ধু সরোজ ইঁদুর হয়েছে। সব ক্যারেকটারই রেডি। হেডস্যার হয়েছেন ঋষিমশাই। টেরিফিক দেখাচ্ছে। যোগীরাজ তপনদা কয়েকবার ৯ সেধে নিয়েছেন। স্টেজে নেমেই ঝট করে একটা আসন মেরে দেবেন। মুকুলের গান রেডি। সঙ্গে বাজবে ঢোল।

নির্মলস্যার মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে সভা দেখছেন। প্রচুর

জমায়েত। বাচ্চাগুলো ডুমো মাছির মতো ওড়াউড়ি করছে। কালো, পাঁশুটে গোটাকতক কুকুরও এসে গেছে। দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। এরই মধ্যে কে কোথায় ধাঁই-ধাঁই করে গোটাকতক চকোলেট বোমা ফাটিয়ে দিল। ঝাঁক-ঝাঁক কাক কা কা করে উড়ছে। কুকুরগুলো গলা ফাটাচ্ছে।

শীতলদা বলল, "এই হল ফোক কালচার।"

নির্মলস্যার ছোটোমতো একটা বক্তৃতা দেবেন। প্রস্তুত হচ্ছেন। শীতলদা বলছে, "বেশি বড়ো করবেন না। লোকে বিরক্ত হয়ে পালাবে। সহজ করে দু'চার কথা।"

নির্মলস্যার বলছেন, "শীতলের মতো ছেলে হয় না। শীতলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনাদের সামনে আসার সুযোগ করে দিয়েছে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। স্বামীজি বলে গিয়েছিলেন, যেরকম শিক্ষা চলছে সেরকম নয়। সত্যিকার কিছু শিক্ষা চাই। খালি বইপড়া শিক্ষা হলে চলবে না। যাতে চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো যায়, এইরকম শিক্ষা চাই। ছোটো ছেলেদের গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা গোছের শিক্ষা দেওয়াটা তুলে দিতে হবে একেবারে। কেউ কাউকে শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষকমশাইরা শেখাচ্ছেন মনে করলেই সব নষ্ট হয়ে যায়। একটি ছেলের ভেতরেই সব আছে। সেগুলোকে কেবল জাগিয়ে দিতে হবে। শিক্ষকের কাজ সেইটাই। যে-বর্ণমালা ভেতরে আছে সেইটাকেই আজ আমরা জাগাব।"

সভার দিকে পেছন ফিরে নির্মলস্যার দু'হাত তুলে চিৎকার করে বললেন, "জাগো, বর্ণমালা জাগো।"

সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল মুকুলের গান, আং নমঃ, ঈং স্বাহা, ঊং বষট, ঐং হুং, ঔং বৌষট, অঃ অস্ত্রায় ফট্। সঙ্গে বিশুর লাগ্‌গুমাগুম ঢোল।

মুকুলের বাবা পুরোহিত। দুর্গাপুজোয় মুকুল বাবার সঙ্গে তন্ত্রধারক হয়। করণ্যাসে অ, ঈ, আ আছে দেখে সেইটাই এখানে ছেড়ে দিল কায়দা করে। জিনিসটা জমেও গেল। ছেলেরা খুব মজা পেয়েছে। ফার্স্ট আইটেম শেষ হওয়া মাত্রই, শীতলদার সঙ্গে যেমন কথা হয়েছিল, একটা বছর তিনেকের বাচ্চা মেয়েকে স্টেজে তোলা হল। এইবার অ আর অজগর একসঙ্গে তেড়ে আসবে।

মুকুল কালোয়াতি সুরে গাইছে, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে। বুকে অ ফিট করে বিশু যেই একপা এগিয়েছে, আমি অমনই অজগর নিয়ে খচরমচর করে ওভারটেক করে যেই না তেড়ে গেছি, মেয়েটা চিল-চিৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে স্টেজ থেকে মেরেছে লাফ। ভয়ে ছুটছে খোলা মাঠের দিকে।

অ-এর ভয়ে যে পালায় তাকে আর কী শেখানো যাবে! অতএব দ্বিতীয় পাঠ, আ-এ আমটি খাব পেড়ে। তারাপদ ভালসা কাঠের আমগাছ নিয়ে স্টেজের মাঝখানে। দুটো ছেলে আমতলায়।

নির্মলসার বলছেন, "পাড়ো বাবা পাড়ো, আ-এ আমটি পেড়ে খাও।"

কুমুদস্যার বলছেন, "একটা-একটা করে পাড়, এক, দুই তিন।"

ছেলে দুটো ঘাড় কাত করে একগুঁয়ের মতো বলল, "পেড়ে খাবুনি গো। বাবা কেন্নে দিলে খাব। চুরি করে খাবুনি। আমরা অমন নয় গো কত্তা। আমাদের ইমান আছে।"

ছেলে দুটো ডাঁটসে স্টেজ থেকে নেমে চলে গেল।

আমরা দু'বার ধাক্কা খেলুম। আমার অজগর দু'পার বেশি এগোতেই পারল না। তারাপদ তার সাধের আমগাছ নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো মাঝমঞ্চে ভ্যাবাচ্যাকা দাঁড়িয়ে আছে। সব প্ল্যান আপসেট। সভা থেকে এক ভদ্রলোক মঞ্চের কাছে এগিয়ে এলেন। বেশ ভালো দেখতে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সুন্দর সাজপোশাক।

তিনি এসেই চ্যালেঞ্জ করলেন, "এসব কী হচ্ছে! হচ্ছেটা কী!"

একটা বড়ো পিঁড়ের তলায় চারটে চাকা লাগানো ছিল। শীতলদার বাড়ির জিনিস। ভাইপোরা গাড়ি-গাড়ি খেলে। শীতলদা সেইটা বাড়ি থেকে আনিয়েছিল। প্ল্যানটা ছিল, হেডস্যার ঋষি সেজে ওটার উপর বসে থাকবেন, আর আমরা গড়গড়িয়ে স্টেজে নিয়ে আসব।

ভদ্রলোকের তেরিয়া প্রশ্ন শুনে, তিনি আমাদের বললেন, পুশ।"

আমরা তাঁকে গড়গড়িয়ে স্টেজে নিয়ে এলুম। একেবারে সামনে, ভদ্রলোকের মুখোমুখি। ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গেলেন।

হেডস্যার ঋষির মতোই হেসে, স্নিগ্ধ গলায় বললেন, "কী হচ্ছে, বুঝতে পারছেন না। আমরা বর্ণপরিচয় করাচ্ছি আধুনিক পদ্ধতিতে।"

ভদ্রলোক বললেন, "একে পরিচয় করানো বলে না, আপনারা বর্ণমালার ভয় দেখাচ্ছেন। একটা শিশু প্রথম অক্ষর থেকেই ভয়ে জর্জরিত হচ্ছে। অ– বলামাত্রই তাকে তেড়ে আসছে অজগর। জ্যান্ত গিলবে। তারপরেই আ-তে নিয়ে গিয়ে অন্যায় শেখাচ্ছেন। পরের বাগানে গিয়ে, পাঁচিল টপকে, আম পেড়ে খাও। রোজগার করে কিনে খাওয়া নয়। জোর-জুলুম করে পেড়ে খাওয়া।"

আচারদাদা পাশ থেকে বললেন, "ওইজন্যেই বলেছিলুম, বদলান, এসব শেখাবেন না। দেশটা এসবেই ভরে গেছে। বলুন, অ-এ আচার খাব পেড়ে।"

ভদ্রলোক ভ্রূকুটি করে বললেন, "কে আপনি? হু আর ইউ?"

"আমি স্যার আচার কোম্পানি, টেস্ট অ্যান্ড ডান্স। এই প্রোজেক্টের স্পনসরার।"

"গাছ থেকে আচার পেড়ে খাবে?"

"গাছ থেকে কেন স্যার! রান্না বা ভাঁড়ার ঘরের কুলুঙ্গি থেকে। ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা। মা সবে একটু গুয়েছেন। চোখ দুটো লেগে গেছে। এময় সময় বিল্টু সোনা, জানলা বেয়ে উঠে আচারের জার খুলে ....ওইজন্যে আমাদের জার তো কাচের নয়, ক্র্যাশপ্রুফ হেলমেটের মতো। পড়ে গেলেও ভাঙবে না। সেন্ট পারসেন্ট সেফ।"

ভদ্রলোক গর্জন করে উঠলেন, "না, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা না বলে আচার পেড়ে খাবে না। ওটাও অন্যায়।"

"তা হলে বর্ণপরিচয় হবে কী করে! তা হলে মুখ্যু হয়েই থাক।"

ভদ্রলোক হেডস্যারকে বললেন, "তারপর ই আর ঈ-এর মধ্যে সম্পর্কটা তৈরি করছেন সদ্ভাবের নয়, খাদ্য-খাদকের। সেকালের ওসব আর চলে না। এইটুকু একটা ইঁদুর, লাভলি ইঁদুর, ভেলভেটি ইঁদুর ভয়ে কুঁকড়ে আছে, একটা ঈগল তেড়ে আসছে। আর সেই হিংসা, সেই ভয়ের দৃশ্যে আপনি সেজে বসে আছেন ঋষি। ঋষিরা এ-যুগে অচল। এ-যুগ হল

প্রতিযোগিতার, সংগ্রামের। লড়াই, লড়াই, লড়াই। লড়াই করে বাঁচতে হবে, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে।"

হেডস্যার থতমত, "বিদ্যাসাগর তো এইভাবেই শিখিয়ে গেছেন, আমরা কী করতে পারি!"

"আপনারা নতুন বর্ণপরিচয় লিখবেন নতুন কালের জন্যে।"

"সেটা কেমন হবে?" হেডস্যারের খুব উৎসাহ।

"যেমন ধরুন, অ-এ অমিতাভ আসছে ওই।"

"সে আবার কে?"

"আরে মশাই অমিতাভ বচ্চন, ন্যাশনাল হিরো, এক্স এম. পি। ছেলে-বুড়ো নাম শুনলে নেচে ওঠে। 'শোলে' দেখেছেন?"

"না ভাই।"

"বাড়ি গিয়ে দেখে নেবেন।"

"আ-তে কী হবে?"

"কেন! আ-তে আমজাদ ঢিসুম-ঢিসুম।"

"আমজাদ আবার কে?"

"বিখ্যাত ভিলেন, শোলের গব্বর সিং। কে না তাঁর নাম জানে।"

"ই-তে কী হবে?"

"ইমরান নিচ্ছে রান।"

"ইমরান কে?"

"উঃ, আপনার অজ্ঞতা আকাশছোঁয়া। ইমরান হলেন পাকিস্তানি টেস্ট ক্রিকেট প্লেয়ার। যখন ওয়ান ডে খেলেন, সবই প্রায় ছয় আর চার।"

নির্মলস্যার বললেন, "স্বামীজিরও ওই এক কথা, শতাব্দীর প্রথম ভাগে বলে গেছেন, সমাজের বৈষম্য দূর করিয়া সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা।"

ভদ্রলোক সমর্থন করলেন, "দ্যাটস রাইট। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজিকে টপকে বেরোবার উপায় নেই।"

হেডস্যারের গালে নকল দাড়ি, কুটকুট করছে। কুড়ুড়-কুড়ুড় করে

চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করলেন, "খুলে ফেললেই তো হয়, আর রেখে কী হবে এই অস্বস্তি!"

হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটানে খুলে ফেলুন, পাটের দাড়ি। ঋষিদের যুগ শেষ, এখন ..... ঋষিকাপুরের যুগ।"

"সে আবার কে?"

"বাবা, বিখ্যাত তারকা, ববি খ্যাত।"

"উ-টা কী হবে?"

"উপেনবাবু হলেন ঘেরাও। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সঙ্গে শিশুদের শৈশব থেকেই পরিচয় ঘটানো। গুডি গুডি, বোকা বোকা বয়েজদের যুগ শেষ। যা হয় তা এখন থেকেই জানুক। বড়ো হয়ে যে ঘেরাও হবে তার সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়বে বর্ণ-পরিচয়ে পড়েছি তো!"

"উ কী করবেন?"

"ভেরি ইজি। ঊর্ধ্ববাহু লাগাও স্লোগান। এটা স্লোগানের যুগ। মিছিলে যেতেই হবে। টিচাররাও মিছিল করে স্লোগান দিতে-দিতে কানু-সিধু-ডহরে যাচ্ছেন। ঋ-তে ঋষি কাপুর ফিট হয়ে গেছে। এরপরে আপনারা ঠিক করবেন। এমন জিনিস ফিট করুন, যা একালের।"

হেডস্যার দাড়ি খুলে ফেলেছেন। নির্মলস্যার বললেন, "তা হলে আমাদের এই পালাটার কী হবে?"

"বাতিল হবে। নতুন যুগের জন্যে নতুন পালা নিয়ে আসবেন।"

হেডস্যার মাথা নেড়ে বললেন, "ইয়েস সার!"

যোগীরাজ তপনদা স্টেজের উপর ম্যাট পেতে খানিক যোগাসন দেখালেন এরপর। সভায় বয়স্ক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা চিৎকার করতে লাগলেন, "ছোকরা অম্বল কীসে কমে!"

যোগীরাজ কম্বলের উপর অম্বলের আসন দেখালেন।

আমরা ঝিম সেরে বাসের আসনে বসে আছি। আচারদাদা সর্বস্ব খুইয়ে চুপসে গেছেন। কুমুদস্যার থেকে-থেকেই বলছেন, "লাভের মধ্যে এই হল, আমার এতকালের রুপোর নস্যির ডিবেটা লস্ট। লস্ট ফর এভার।"

হেডস্যার বললেন, "এতদিনে ধরতে পারলুম আমার কীসে

অ্যালার্জি! জুটে। যেই গোঁফ-দাড়ি পরেছি, অমনই শুরু হয়েছে হাঁপানির টান। বাড়ি ফিরেই সব চটের ব্যাগ দূর করব। প্লাস্টিক। এজ অব প্লাস্টিক।"

হেডস্যার হাঁপাচ্ছেন। বুকে সাঁইসাঁই শব্দ।

নির্মলস্যার বলছেন, "এতদিনে বুঝলুম, কেন সবাই ইংলিশ মিডিয়ামের জন্যে পাগল! অ, আ, ক, খ-এ বহুত ঝামেলা। এ বি সি অনেক সিম্পল।"

অন্ধকার পথ ধরে বাস চলছে। পেছনে কাগজের অজগরের খচরমচর শব্দ। ঈগলের তালপাতার ডানা ঘাড়ের কাছে খোঁচা মারছে।

শেষ মারটা মারলেন আমাদের আচারদাদা।

স্কুল কম্পাউন্ডে আমরা বাস থেকে নেমেছি, তখনও সোজা হয়ে ভালো করে দাঁড়াইনি, আচারদাদা বললেন, "স্যার! বিলটা তা হলে স্কুলের সেক্রেটারির নামেই হবে!"

"কীসের বিল?"

"দশ পেটি জ্যাম, জেলি, আচার, আর এক হাজার চামচে।"

হেডস্যারের দম একেবারেই আটকে গেল। বিল তখন মাথায়। যোগীরাজ পিঠের দু'পাশে চাপড় মারছেন। নির্মলস্যার চিৎকার করছেন, "ইনহেলার, ইনহেলার।"

রাবণবধ

ভীষণ উত্তেজনা, হইহই কাণ্ড। স্কুলের 'অ্যানুয়াল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনি' এসে গেছে। এবারে খুব ঘটা হবে। স্কুলের মাঠে প্যান্ডেল বাঁধা শুরু হয়ে গেছে। হেডমাস্টারমশাই আর স্কুল সেক্রেটারি কেবল বলছেন, ''অ্যাটলিস্ট থাউজেন্ড, মিনিমাম হাজার লোকের অ্যাকোমোডেশন চাই। তার কমে হবে না। গভর্নর আসছেন। এই স্কুলের ইতিহাসে এই প্রথম। রেড কার্পেট চাই। মিনিমাম এক মন ফুল।''

অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারমশাই খুব স্পষ্টবক্তা। পান খান দোক্তা দিয়ে, সেই কারণে জিভ অতিশয় ধারালো। জমিদারের ছেলে। কারও পরোয়া করেন না। বাড়িতে রাধাগোবিন্দের মন্দির। অষ্টধাতুর যুগল মূর্তি। মাথায় ছাতা। ওই সেই মিনিমাম। কমসে-কম তিনশো ভরি সোনা। পূর্বপুরুষের কেরামতি। সারারাত লাঠি হাতে মন্দির-চাতালে জেগে থাকেন। ঘুমোলেই ছাতাসমেত মূর্তি হাওয়া হয়ে যাবে। ভগবান বড়ো, না সোনা বড়ো! অবশ্যই সোনা। এ শোনা কথা নয়। প্রত্যক্ষ সত্য।

অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড পানঠাসা মুখে, ফোলা-ফোলা শব্দে বললেন, ''এক মন ফুল! ইউ আর এ ফুল। এখানে কি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হবে! এই স্কুল আমার পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি নয়াপয়সা হিসেব করে খরচ করতে হবে। হার্ড ডেজ। মানুষের হাঁড়ি চড়ছে না। এক মন ফুল।'' বলেই, সেই কোটেশনটা হাঁকড়ে দিলেন, যেটা আমরা রচনা লিখতে গেলেই কায়দা করে ঢুকিয়ে দি, ''লাইফ ইজ নট এ বেড অব রোজেস। এক মন ফুল কী করবেন?''

হেডমাস্টারমশাই সাহিত্যের মানুষ। কল্পনার জগতে বিচরণ করেন। তাঁর চোখ ঢুলু-ঢুলু হয়ে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, ''ফ্লোর‍্যাল ওভেশন টু হিজ একসেলেন্‌সি। লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে দু' দিকে দাঁড়িয়ে থাকবে দু' সার মেয়ে, হাতে শঙ্খ।''

''শাঁখ বলতে পারেন না?''

খিঁচিয়ে উঠলেন সহপ্রধান, ''সবসময় শুদ্ধ ভাষা। যেন বিশুদ্ধ

গব্যঘৃত! শঙ্খ, লম্ফ, ঝম্প। শুদ্ধ বলবেন তো পুরোটাই শুদ্ধ বলুন, দুই পার্শ্বে রমণীগণ শঙ্খ হস্ত দণ্ডায়মান থাকিবে।"

"আপনার মশাই অত্যন্ত ইরেশেবল টেম্পারামেন্ট।"

"অ্যায়, আবার ওয়েবস্টার থেকে একটা পটকা ছাড়লেন। ইংরেজিতে, বাংলাতে, সংস্কৃতে জগাখিচুড়ি। হিন্দিটা বাকি থাকে কেন! কিশমিশের মতো ঢুকিয়ে দিন।"

হেডমাস্টারমশাই আবার তাঁর নিজের ভাবে ফিরে গিয়ে বলতে লাগলেন, "এধারে কুড়িজন বালিকা, ওধারে কুড়িজন বালিকা। লাল কার্পেটের উপর দিয়ে মাননীয় রাজ্যপাল এগিয়ে আসছেন। চল্লিশটা শাঁখ একসঙ্গে বাজছে, পুঁউউউ।"

"চল্লিশটা শাঁখ একসঙ্গে বাজতে পারে না, অসম্ভব।"

"কেন পারে না! চল্লিশটা শাঁখ, চল্লিশজোড়া ঠোঁট। ফুঁউউউ।"

"অতই সোজা! শাঁখ কোনওদিন বাজিয়েছেন নিজে! মোস্ট ডিফিকাল্ট ইনস্ট্রুমেন্ট অন আর্থ। আমার স্ত্রী একদিন বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌ল নিয়ে বসে আছ থাকো, তাতে তোমার খাই-খাইটা একটু কমবে, তবে ঠাকুরঘরে ঠিক সময়ে সন্ধেটা যেন পড়ে। তিনবার শাঁখ বাজাবে।' অতঃপর সন্ধ্যাকালে মধ্যগগনে তারার চক্ষু ফুটিবামাত্র ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলাম, দ্বারদেশে গঙ্গাজল ছিটাইলাম, তিনবারের প্রচেষ্টায় দীপ জ্বলিল, বাতাস কম্পমান, মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধার মতো খাবি খাইতেছে দেখিয়া দক্ষিণের গবাক্ষ বন্ধ করিলাম, একজোড়া ধূপ জ্বালাইয়া, নৃত্য করিতে-করিতে চিত্রপটসমূহে আরতি করিলাম। তাহার পর ওষ্ঠে তুলিলাম সিন্দূরচর্চিত শঙ্খ। ভাবিয়াছিলাম সহজ হইবে। মহাশয়, প্রথমে মৃদু ফুঁ মারিলাম। ফুস করিয়া তাহা পশ্চাদ্দেশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। নির্গমনপথ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া আবার মারিলাম, এইবার সবেগে। পুঁ শব্দ নির্গত হইল না। মুখে গঙ্গাজল ঢালিলাম।"

"কাহার মুখে?"

"অবশ্যই শঙ্খের মুখে। এমত মূর্খ আমাকে ভাবিবেন না, যে নিজের মুখে দূষিত গঙ্গাজল ঢালিব! জলের ব্যাপারে আমি অতিশয় সতর্ক। জলই সকল রোগের উৎস। শঙ্খের ছিদ্রে জল দিয়া হাতের তালু তাহার উপর

বারকয়েক ঠুকিলাম। পুঁত-পুঁত করিয়া শব্দ হইল। ভাবিলাম, শঙ্খ এইবার আর্তনাদ করিবে। গন্ডদেশ স্ফীত করিয়া সবেগে ফুঁ মারিলাম। ফুঁ ফসকাইয়া গেল। শঙ্খ শব্দ করিল না। আমার মেজাজ ক্ষিপ্ত হইল। স্বাধীনতাসংগ্রামীর মতো মনে-মনে বলিলাম, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। প্রতিবেশীর আলয়ে-আলয়ে শঙ্খ বাজিয়া গেল। আমার শঙ্খ নীরব। কেবল আমার ফুৎকারের শব্দ। শঙ্খের পরিবর্তে নিজেই ফুঁ-ফুঁ করিয়া বাজিয়া চলিলাম। রক্তের চাপ বাড়িয়া গেল। চক্ষুদ্বয় রক্তগোলক হইল। মানসলোকে অশ্লীল শব্দসমূহ ঘুরপাক খাইতে লাগিল। গণ্ডদেশ টাটাইয়া উঠিল। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় আমার স্ত্রী আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। বৈদ্য আসিয়া বিধান দিলেন, দুই গণ্ডে বরিক কম্প্রেস। গাল ফুলিয়া গোবিন্দর মা হইয়া তিন দিবস চিতপাত। আমার ধর্মপত্নী কহিলেন, পাপীরা শঙ্খ বাজাইতে পারে না। উহা পুণ্যবানের কর্ম। অতএব মহাশয়, ওয়ান, টু, থ্রি চল্লিশটি শঙ্খ একই সঙ্গে বাজিবে, এমন উচ্চাশা করিবেন না। অতিশয় বিপাকে পড়িবেন।''

হেডমাস্টারমশাই বললেন, ''দুশ্চিন্তা অথবা আনন্দের কোনও কারণ নাই। আমি প্রতিদিন অনুশীলন করাইব। অনুশীলনে পণ্ডিতও মুর্খ হইয়া যায়। বোধ হয় ভুল বলিলাম। অনুশীলনে অপটুও পটু হইয়া যায়। এইবার কল্পনা করুন সেই অনির্বচনীয়, স্বর্গীয় দৃশ্য। মহামান্য রাজ্যপাল ধীরে-ধীরে আসিতেছেন। শঙ্খ নির্ঘোষে আকাশ-বাতাস কম্পিত হইতেছে। চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। নেপথ্যে গীত হইতেছে আগমনী সঙ্গীত, শঙ্খে-শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে।''

সহপ্রধান গলা বিকৃত করে বললেন, ''রাজ্যপাল যদি জননী হন তাহা হইলে আপনার ব্যাকরণ-জ্ঞান সম্পর্কে আমার সন্দেহ হইতেছে। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণখানি পড়িবার অনুরোধ জানাইতেছি। বৃদ্ধ হইলেও শিক্ষা গ্রহন করিবার কোনও বয়স নাই। পুত্রের সহিত মূর্খ পিতাও একই শ্রেণীতে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।''

মহাশয়, জ্ঞান আপনারই লাভ করা উচিত। যিনি পালন করেন, তিনিই পাল, তিনিই জননী।''

''আপনার মুণ্ডু। যিনি পালন করেন, তিনি পিতা। পালের স্ত্রীলিঙ্গ পালিকা। গাল বন্ধ করুন। রাজ্যপাল অপমানিত হইলে বিদ্যালয়ের 'এড'

বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের হাঁড়িসকল শিকায় উঠিবে। আর এক মন অক্ষত পুষ্প ভদ্রমহোদয়ের মস্তকে বর্ষিত হইলে আনন্দোৎসব শোকসভায় পর্যবসিত হইবে। পতাকা অর্ধনমিত হইবে। হত্যার অপরাধে কারারুদ্ধ হইবেন। এক মন পুষ্প নহে, এক সের পুষ্পচূর্ণ ক্রয় করিলেই যথেষ্ট হইবে। সর্ব বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাই আপনার চিরকালের অভ্যাস। রাজপুরুষদের তৈলমর্দন করিয়াই আপনি আখের গুছাইয়াছেন। আপনার কোনও তুলনা নাই।''

প্রধানশিক্ষকমশাই রেগে ঘরের বাইরে উঠে গেলেন। সহপ্রধানশিক্ষক হা-হা করে হাসতে লাগলেন। আমরা ছাত্ররা বোকার মতো বসে রইলুম। মিটিং-এ আরও অনেক আলোচনার বিষয় ছিল। ছেলেরা নাটক মঞ্চস্থ করবে। কী নাটক, কোন নাটক, কে-কে অভিনয় করবে, এইসব আলোচনা হলই না। বাংলারসার ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ''যে কোনও সভা পণ্ড করার প্রতিভা আপনার অসীম। বয়েস বাড়ছে, না কমছে! ছাত্রদের উপস্থিতিতে এই আচরণ শ্লাঘার নয় মোটেই। লজ্জিত হওয়া উচিত।''

সহপ্রধান হাসতে-হাসতে বললেন, ''আপনাদের এই বাংলার টিচারদের স্টকে ওই একটা শব্দই আছে, শ্লাঘা। শুনলেই কুঁই-কুঁই করে হাসতে ইচ্ছে করে। শ্লাঘা, বল্যা, বল্কল, গালা। সহজ ভাষায় কথা বলতে পারেন না। শুনুন, জীবনের সব কিছুকে লঘু করে নিতে শিখুন। আনন্দ, আনন্দ।''

তিনি হাঁক পাড়লেন, ''কী হল! কোথায় গেলেন মশাই! পুরুষের রাগ পাঁচ মিনিটের বেশি থাকা উচিত নয়। চলে আসুন। গরম ফুলকপির শিঙাড়া খাওয়াব!''

ঘরের বাইরেই স্কুলের দোতলার ছোটো ছাত। ইংরেজ আমলের বাড়ি। সেই কারণেই আলসের খুব শোভা। অনেকটা গড় মান্দারণের মতো। ফুলগাছের টব সাজানো। গাছ নেই, ফুলও নেই। খটখটে শুকনো মাটি। কে যত্ন করবে? হেডমাস্টারমশাই ছাত থেকে বললেন, ''আমার খুব নস্যি নিতে ইচ্ছে করছে। ডিবে ফেলে এসেছি।''

সহপ্রধান বললেন, ''সে-ব্যবস্থা হবে। দয়া করে ঘরে আসুন। মিটিং বন্ধ হয়ে আছে।''

হেডমাস্টারমশাই বললেন, ''যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেল!''

"কী আবার হল!"

"করে দিয়েছে।"

"কী করে দিয়েছে।"

"তিনতলার আলসেতে কাক বসেছিল, একেবারে ডাইরেক্ট হিট।'

"কোথায়?"

"পাঞ্জাবির পিঠে।"

"চলে আসুন। শুভ লক্ষণ। আগাম জানিয়ে দিয়ে গেল, আপনি স্ট্যাচু হবেন। সারা বছর ধরে কাক পার্কে-পার্কে স্ট্যাচু হোয়াইটওয়াশ করে। মশাই, আপনার যশ-খ্যাতি এমনই সুবিস্তৃত হবে যে, আপনার মূর্তি স্থাপন করবেন সরকার।"

হেডমাস্টারমশাই ঘরে এলেন, "গা ঘিনিঘিন করছে, কারণ কাক বড়ো কুখাদ্য খায়।"

"খেলেই বা, পেটে গিয়ে সব চুন হয়ে যায়। ওদের পেটে একধরনের কেমিক্যাল থাকে, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। ঘিনঘিন করার কোনও কারণ নেই। দেখেননি বিদ্যাসাগর, রামমোহন, স্যার আশুতোষ, গিরিশচন্দ্র, সব সাদা হয়ে বসে আছেন। তাঁদের গা ঘিনঘিন করছে কী! ছটফট না করে স্থির হয়ে চেয়ারে বসুন।"

হেডমাস্টারমশাই চেয়ারে সিঁটিয়ে বসলেন। বাংলারস্যার কনভেনার। তিনি বললেন, "কাজের কথায় আসা যাক।"

সহপ্রধান বললেন, "আসা যাক।"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "নস্যি আর শিঙাড়া!"

অঙ্কেরসার ডিবেটা এগিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "নস্যিটা দিতে পারছি। শিঙাড়া আমার দায়িত্ব নয়।"

সহপ্রধান বললেন, "দোকানের শিঙাড়া খাওয়া উচিত নয়। খেলেই অম্বল। আজ সকালে গ্যাস লিখিয়ে এসেছি। দশ-বারো দিন পরে এসে যাবে, তখন একঝুড়ি ভেজে এনে খাওয়াব। বড়ো-বড়ো ফুলকপি, কড়াইশুঁটি, বাদাম। সে-জিনিস খেলে তুরীয় অবস্থা হবে।" হেডমাস্টারমশাই শাঁ করে নস্যি নিয়ে বললেন, "জানতুম। ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার। তা না হলে

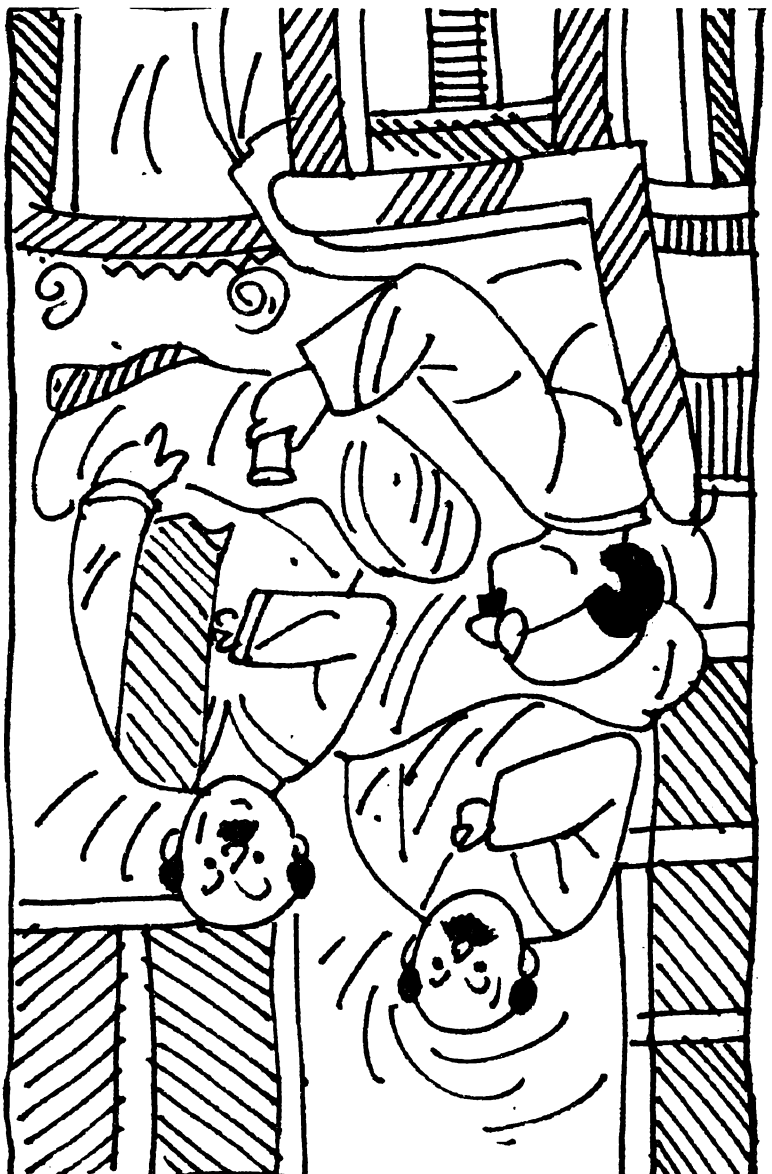

বড়ো রাস্তার উপর অত বড়ো বাড়ি এই বাজারে করা যায়!"

"অবশ্যই যায়। সিগারেট, নস্যি, চা, তিনটেই খাই না। বিয়ে, পৈতের নেমন্তন্ন অ্যাটেন্ড করি না। বাড়িতে কোনও কাজের লোক রাখিনি। শ্যাম্পু ব্যবহার করি না। ট্যাক্সি চাপি না। রেস্তরাঁয় ঢুকে চপ-কাটলেট খাই না। সেইজন্যে আমার অসুখ করে না, কথায়-কথায় ডাক্তার ডাকতে হয় না। মামলা-মোকর্দমায় জড়িয়ে পড়ি না। পছন্দ হয়েছে বলেই জিনিস কিনে ফেলি না, প্রয়োজন হলে তবেই কিনি। ভাত-ডাল, ডাল-রুটি এই আমার খাদ্য। দু'বেলা দু'বার পেট ঠুসে খেয়ে নিই। খুচুরখুচুর জলখাবার আর খেতে হয় না। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিশি না। টাকা ধার চাইতে পারে না। ফলে, আমার একের-চার খরচ, তিনের-চার সঞ্চয়।"

বাংলারস্যার বললেন, "এরকম একটা জীবনকেই বলে, আমার জীবনই বাণী। করমবীর, ধরমবীর।"

"সভার কাজ শুরু করুন।" গম্ভীর গলায় আদেশ করলেন অঙ্কেরস্যার।

সহপ্রধান বললেন, 'রাজ্যপালকে আনার কী দরকার শুনি! পুলিশে-পুলিশে সব ছয়লাপ। সিকিউরিটি। কম্যান্ডো। স্বাভাবিক অবস্থা বিপর্যস্ত। আমার মনে হয় এই জায়গাটা আমরা আর-একবার রি-কনসিডার করতে পারি।"

প্রধানশিক্ষক বললেন, "হরিনারায়ণ বিদ্যাপীঠ গভর্নরকে এনেছিল।"

"এনেছিল এনেছিল, সো হোয়াট। ওরা এনেছিল বলে আমাদেরও আনতে হবে!"

"ম্যাটার অব প্রেস্টিজ।"

"বারোয়ারি পুজোর মেজাজ নিয়ে স্কুলের অ্যানুয়াল করবেন! প্রতিষ্ঠানের কথা, নিজেদের বয়েসের কথাটা একবার ভাববেন না!" মুখ বিকৃত করে বললেন, "হরিনারায়ণ এনেছিল। তা হলে তো আমাদের প্রেসিডেন্টকে আনতে হয়!"

বাংলারস্যার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "কী যন্ত্রণা মশাই! এইভাবে মিটিং চালানো যায়!"

"খুব যায়। মিটিং মানেই দু-দশ কথা। তর্কাতর্কি। পড়েননি!

অ্যাসেমব্লিতে কী হয়! জুতো ছোড়াছুড়ি, ওয়াকআউট! এসব যদি না-ই হল, তো মিটিং হল কী!''

''হেডমাস্টারমশাই একবার ওয়াকআউট করেছেন, করে এই মিটিং-এর গর্ব বাড়িয়েছেন। এইবার নেক্সট আইটেম। রাজ্যপাল ধীরে ধীরে কামিং, সামনে ভগীরথ, হাতজোড়। কে ভগীরথ হবে!''

''অবশ্যই হেডমাস্টারমশাই, কারণ তিনি এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের হেড।''

''বেশ, ভালো কথা, কিন্তু দেয়ার ইজ এ বাট। সেটা হল পায়ে আর্থারাইটিস। হাঁটার সময় একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। দৃশ্যটা অবলোকন করুন। সামনে খোঁড়া ভগীরথ লিম্পিং, পেছনে স্ট্রেট রাজ্যপাল গ্যাটম্যাট। কেমন দেখাবে!''

''ভগীরথের বয়েস হয়েছে, বাত অবশ্যই হতে পারে।''

''আমার সাজেশান, হেডমাস্টারমশাই পেছনে থাকুন। তিনি পেছন দিক থেকে গঙ্গাকে পুশ করবেন।''

সহপ্রধান বললেন, 'যদি গ্রেস আর ডিগনিটির কথা বলেন, তা হলে সামনে থাকবেন আমাদের গেমটিচার। পারফেক্ট হেল্‌থ, মিলিটারি-চলন। আর আমরা সব ফুটকড়াইয়ের মতো পেছনে-পেছনে গড়াতে-গড়াতে আসব।''

'হেডমাস্টারমশাই কী বলেন?'

''নট এ ব্যাড প্রোপোজাল। অ্যাকসেপটেড।''

''রাজ্যপাল সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চে উঠছেন!''

''ওয়েট। সিঁড়িটা কেমন হবে! গেল, গেল, মচকে গেল টাইপ!'' সহপ্রধান বাধা দিলেন, ''রাজ্যপালকে দাঁড় করিয়ে রাখুন। আগে মঞ্চটা পাকা হোক। মঞ্চটা হচ্ছে কোথায়! সাইজ কী! ডেকরেশান কেমন?''

হেডমাস্টারমশাই বললেন, ''আপনি ট্রেজারার। দ্যাট ইউ আর টু ডিসাইড। কাট ইয়োর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ক্লথ।''

''বাঃ, বেশ কথা! রাজ্যপাল আপনার, আর মঞ্চ আমার! সাধারণ কোনও লোক হলে আমি যেমন-তেমন তক্তা ফেলে যা হোক না হোক একটা কিছু বানিয়ে দিতুম। একটা বেঞ্চ রেখে বলতুম, যার হোক কাঁধে ভর

রেখে উঠে যান। আমার কম খরচে হয়ে যেত। এ এক ভি ভি আই পি-কে এনে ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন! এ তো এখন রীতিমতো ডায়াস চাই। শুধু তাই নয়, আগের দিন সিকিউরিটির সাতজন এসে নেচেকুঁদে শক্তি পরীক্ষা করে যাবে। যতক্ষণ রাজ্যপাল ডায়াসে থাকবেন, ততক্ষণ সিকিউরিটির দু'জন তলায় হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকবে। মঞ্চটাকে সেইজন্যে রীতিমতো উঁচু করতে হবে।''

হেডমাস্টারমশাই বললেন, ''আপনার আবার বেশি-বেশি। অতসব করতে হয় না!''

''কিসুই জানেন না, চুপ করুন। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, এঁদের জীবনের কোনও দাম আছে! একটু আলগা দিলেই সন্ত্রাসবাদীরা নির্মমভাবে মেরে ফেলবে। মনে নেই, রাজীব গান্ধিকে কীভাবে মারল আর ডি এক্স দিয়ে!''

''এখানে সন্ত্রাসবাদী কোথায়!''

''মাথামোটা! এখানে এখন কোনও মাছি আছে? নীল-নীল ডুমো-ডুমো মাছি?

''নেই।''

''একটা আম আনুন, আমি ছুরি দিয়ে কাটছি। দেখি মাছি আছে কি নেই! সন্ত্রাসবাদীরা গন্ধে-গন্ধে উড়ে আসে।''

''একটা নিরীহ রাজ্যপালকে মেরে লাভ?''

''আপনার ওই পোস্ত আর ডাঁটাচচ্চড়ি খাওয়া মাথায় ঢুকবে না। এটা একটা বাদ, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, সমাজবাদ, বহুজন সমাজবাদের মতোই সন্ত্রাসবাদ। বড়ো-বড়ো কিছু লোককে বাদ দেওয়াই যাদের কাজ। উইবাদ, ইঁদুরবাদের মতো।''

''শেষের দুটো কী বললেন?''

''ইঁদুর আর উই, জিজ্ঞেস করে দেখবেন তো, রবীন্দ্র রচনাবলী খেলে কেন? দাঁত বের করে হাসবে, জানি না তো সার। এইটাই আমাদের বাদ, ইজ্‌ম। ইঁদুরজ্‌ম। আপনি মশাই বহুত খরচের ধাক্কায় ফেলে দিলেন। রীতিমতো একটা মঞ্চ চাই। লাল কার্পেট পাততে হবে। রাজার সিংহাসনের

মতো চেয়ার। গলায় গোড়ের মালা দিতে হবে।"

বাংলারস্যার বললেন, "দ্যাট্স নো প্রবলেম। আমার নাতনিটা একেবারে ফুটফুটে, জাস্ট লাইক এ ডলপুতুল, সেই নাচতে-নাচতে এসে মালাটা পরিয়ে দেবে।"

"বাংলার শিক্ষক যখন ইংরেজি বলেন, তখনই জানবেন রিয়েল প্রবলেম। গভর্নরের গোড়ের মালা। এ আপনার দু-দশ টাকার কর্ম নয়। মিনিমাম টু হান্ড্রেড। বাঘের লেজের মতো ইয়া মোটা। সব টাকা তো আপনার ফুল আর প্যান্ডেলেই ফৌত হয়ে যাবে। ছেলেদের পুরস্কার আর দেবেন কী করে।"

হেডমাস্টারমশাই কাচুমাচু মুখ করে বললেন, "রাজ্যপালকে তা হলে বাদই দিয়ে দিন।"

"কী করে দেবেন! তাঁর অ্যাকসপটেন্স চিঠি এসে গেছে। তাঁর ডায়েরিতে এন্ট্রি হয়ে গেছে।"

"পরিষ্কার একটা রিগ্রেট লেটার, অনারেবল সার, ডিউ টু শর্টেজ অফ ফান্ড, উই আর আনএব্ল টু হ্যান্ডল টু ইউ। ইউ আর টু কস্টলি ফর আওয়ার পুয়োর স্কুল।"

সহপ্রধান চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন, "সাধে মাথা মোটা বলি! আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে তো! মানসম্মান! টাকা তুলতে হবে। ড্রাইভ দিন। ডোনার্স, অভিভাবক। দোরে-দোরে ঘুরতে হবে। কত বড়ো কথা, রাজ্যপাল আসছেন! রোমাঞ্চ হচ্ছে। আজি পুলকিত ধরণী আনন্দে।"

অঙ্কেরস্যার বললেন, "এতক্ষণে মনে হচ্ছে জিনিসটা আপনাকে ধরেছে। গ্রিপ করেছে। আপনি একবার ধরে নিলে কোনও ভাবনা নেই। স্ট্রেট বেরিয়ে যাব, উইথ ফ্লাইং কলার্স।"

সহপ্রধান সোজা হয়ে বসে বললেন, "দেখি, প্যাডটা এগিয়ে দিন।"

হেডমাস্টারমশাই তড়িঘড়ি প্যাডটা এগিয়ে দিলেন।

"এ ডটপেন প্লিজ। আমারটা গেছে। কে যে মেরে দিলে!"

হেডমাস্টারমশাই ডটপেন দিলেন। সহপ্রধান প্যাডের কাগজে নকশা আঁকছেন আর বলছেন, "মঞ্চটা ইস্ট-ওয়েস্টে লম্বা হবে, ফেসিং সাউথ।

পূব দিকে তিনধাপ সিঁড়ি, নট মোর দ্যান দ্যাট। বৃদ্ধ মানুষ। হার্টে চাপ পড়ে যাবে। সিঁড়ি বেশ চওড়া, উইথ হাতল। হ্যান্ড রেল থাকা ইচিত, ফর প্রোটেকশন। তিনজন পাশাপাশি উঠতে পারে এতটাই চওড়া। দু'পাশে দু'জন সিকিউরিটি, মাঝখানে রাজ্যপাল। পেছনে তিনজন। রাজ্যপালকে ঘিরে থাকবে হিউম্যান ওয়াল। মঞ্চের মাঝখানে রেড কার্পেট। সেন্টারে সিংহাসন চেয়ার, দু'পাশে সাধারণ চেয়ার। সামনে একটা লম্বা টেবিল। শক্তপোক্ত। লড়বড়ে লয়। সরি! নড়বড়ে নয়, গর্জাস টেবিলক্লথ। ড্রয়িং পিন দিয়ে ফিক্স করা। নয়তো বারেবারে গুটিয়ে যাবে, ঝুলে যাবে, এলোমেলো হয়ে যাবে। যা অন্যসব সভায় হয়। মশাই! দেখে শিখতে হয়। যদি শিখতেই না পারলেন, তা হলে কীসের শিক্ষক!"

"ফুলদানি সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন? সবার আগে তো ওই দুটোই উলটে কিছুক্ষণের জন্য সভা পণ্ড করবে। অথচ দুটো ফুলদানি তো টেবিলে রাখতেই হবে। টেবিলের শোভা।"

'নো ফুলদান। অত্যন্ত ছেঁচড়া জিনিস। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, ফুলের ভারে টলে পড়ে যায়। মুখ আড়াল করে। দর্শকদের চিৎকার। ফুলদান আমরা রাখবই না। তার বদলে থাকবে ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট, যাকে বলে ইকেবানা। পোর্সিলেনের একটা গামলা। তাইতে নানারকম ফুলের ফ্যাঁসফোঁস। ঝাঁটাকাঠি, মাথার আলু গোঁজা। একেবারে ফ্ল্যাট। কেতরে যাওয়ার ভয় নেই।"

"কে করবে ওই ইবেকানা?"

"আঃ, ইবেকানা নয়, ইকেবানা। কে আবার করবে? আমি করব। কসমস, অ্যাস্টার, গ্ল্যাডিওলি, নস্ট্রাসিয়ান কিনে আনব। দেখবেন, সে যা হবে না! ফ্যান্টাসটিক। আচ্ছা, ডায়াস প্ল্যানিং হয়ে গেল!"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "মনে থাকে যেন, সবশেষে ওই মঞ্চে থিয়েটার হবে, রাবণবধ।"

"ওব্বাবা, গোদর উপর বিষফোঁড়া। থিয়েটার ঢুকিয়েছেন!"

"ঢোকাব না! ছেলেরা সব মুখিয়ে আছে। থিয়েটার করবে। একটু বিচিত্রানুষ্ঠান মতো হবে।'

"তা হলে তো স্টেজ করতে হবে। ড্রপসিন লাগাতে হবে। উইংস রাখতে হবে। হয়ে গেল! ডবল খরচ। একটা সেটেই হবে, না দৃশ্য পালটাতে হবে?"

বাংলারস্যার বললেন, "দৃশ্য তো পালটাতেই হবে। পালাটা তো আমিই লিখছি।"

"সে আপনি একটা কেন, দুশোটা লিখুন; কিন্তু সেট সেটিংস, ড্রেস, মেকআপ, এইসবের খরচ কে জোগাবে?"

"সেটা তো আমার জানার কথা নয়। আমি নাট্যকার, ডিরেক্টর। আপনারা আমাকে স্টেজ দেবেন, আমি দর্শকদের ভালো পালা দেব। টাকার চিন্তা আপনার।"

"আপনারা প্রত্যেকেই তা হলে আপনাদের স্ত্রীর একটা করে গয়না এনে জমা দিন। বিক্রয়লব্ধ অর্থে আমাদের ফাংশান হবে। তা না হলে এত টাকা আসবে কোথা থেকে!"

"কেন আসবে না! কিশোর সঙ্ঘের কালীপুজোর বাজেট কত টাকা জানেন? পাঁচ লাখ।"

"তা হলে এক কাজ করুন। কিশোর সঙ্ঘের সেক্রেটারিকে ডেকে আনুন। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে কোন মূর্খ হাজার-হাজার টাকা চাঁদা দেবে শুনি! না দিলে প্রাণের ভয় আছে কী! ভয় না দেখালে মানুষ দান করে না। আপনারা পারবেন ছোরাছুরি নিয়ে চাঁদা আদায় করতে? জেনে রাখুন, এ-দেশে এখন স্কুলের চেয়ে ক্লাব বড়ো।"

বাংলারস্যার বললেন, "আপনার কাছে আমি সারেন্ডার করছি স্যার, যেভাবেই হোক আমাদের নাটকটা তুলে দিন স্যার। ছেলেরা আশা করে আছে।"

সহপ্রধান একটু যেন খুশি হলেন, কারণ পকেট থেকে পানের ডিবে আর জর্দার কৌটো বের করলেন। প্রধানশিক্ষক করুণ গলায় বললেন, "এখন আবার পান কেন, অনেকক্ষণ যে কথা বলতে পারবেন না, পানঠাসা মুখে কেবল উঁ-উঁ করবেন। এখন আমাদের ঘোর সঙ্কট, এই সময় আপনার কথা বন্ধ হয়ে গেলে কেমন করে চলে।"

"দ্যাটস ট্রু," সহপ্রধান ডিবে স্পর্শ করলেন না। বাংলারস্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার দৃশ্য ক'টা? নাটকটার কাঠামো সংক্ষেপে বলুন।"

বাংলারস্যার উৎসাহিত হয়ে বললেন, "পুরোটা শুনবেন? খাতাটা আমার কাছেই আছে।"

"না, না, পুরো নাটক শোনার মতো মনের অবস্থা এখন নেই। এখন শুধু টাকা আর টাকা। ইন এ নাটশেল দৃশ্যগুলো বলুন। সেইটাই মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান ইয়োর নাটক।"

বাংলারস্যার শুরু করলেন, "অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ। সিংহাসনে রাজা দশরথ। চারপাশ একেবারে ঝলমল-ঝলমল করছে।"

"কীসে ঝলমল করছে! ঝলমল করবে কেন?"

"রাজঐশ্বর্যে ঝলমল করবে। অযোধ্যা ছিল গোল্ডেন সিটি।"

"আপনার ঐশ্বর্য কোথায়? ঝলমলটা করবেন কী দিয়ে? হেডমাস্টারমশাইয়ের চেয়ারটা হবে সিংহাসন। বাকি ঝলমলের পয়সা নেই। বরং ফুটনোটে লিখে দিন, রাজা দশরথের আর আগের অবস্থা নেই।"

"এই ঝলমলের ব্যাপারে আমার একটা প্ল্যান আছে, রোলেক্সের লম্বা-লম্বা রিবন চারপাশে ঝুলিয়ে দেব। বাতাসে দুলবে আর ঝকমক-ঝকমক করবে। যে-কোনওরকম একটা ঝকমক হলেই হল।"

"সেই রোলেক্স রিবনের দাম কত?"

"ও আপনার সামান্যই দাম।"

"পরে কী কাজে লাগবে?"

"ও আর কী কাজে লাগবে। ঠিকমতো রাখতে পারলে, পরে সরস্বতী পুজোর ডেকরেশনে ব্যবহার করা যাবে। হেডমাস্টারমশাইয়ের চেয়ারটাকে একটু সিংহাসনের মতো করে সাজাতে হবে। সে আপনার ছেলেরাই করে নেবে। কিন্তু পিছনে একটা সিন চাই। একটু থামটাম, খিলান, রাজপ্রাসাদে যেমন থাকে আর কী!"

"সিন আমি ভাড়া করতে পারব না, অনেক খরচ। কাগজে বড়ো-বড়ো করে লিখে পেছনে টাঙিয়ে দেবেন রাজপ্রাসাদ। সবাই বুঝে নেবে।"

"ওটা রবীন্দ্রনাটক হলে হত। অ্যাবস্ট্রাক্ট স্টেজ। আমাদের এই পৌরাণিক পালায় একটু গর্জাস ব্যাপারস্যাপার দরকার। ঝলমলে স্টেজ, ঝলমনে পোশাক। পেছনে অন্তত দুটো সিন আপনি অ্যালাউ করে দিন। একটা রাজসভা, সেটা আমরা দশরথে লাগাব, রাবণেও লাগবে। আর-একটা বনের সিন।"

"দুটোতে হবে না, আপনার তিনটে চাই। একটা সমুদ্র না হলে হনুমান লাফ মারবে কোথায়!"

"সমুদ্রটা যদি আমরা উহ্য রাখি। বানরসেনাদের একেবারে সোজা লঙ্কায় ল্যান্ড করিয়ে দিলুম। দু'চার ডায়লগের পরই, যুদ্ধ। এক রাউন্ড কী দু'রাউন্ডের পরই রাবণবধ। ছেলেরা অবশ্য যুদ্ধটাকে একটু বাড়াতে চাইছে। আসলে ওইটাই তো মেন অ্যাট্রাকশন ওদের।"

"সেটা আমিও বুঝি; কিন্তু বানরসেনা কি হেলিকপ্টারে ল্যান্ড করবে! একটা সিন চাই, সমুদ্র, তার উপর দিয়ে হনুমান উড়ে যাচ্ছে, 'থাই এয়ারওয়েজ'-এর বিমানের মতো স্টেজে তখন সমুদ্রের দিকে মুখ করে আপনার ছেলে-হনুমানেরা খড়ের লেজ খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকবে সার-সার। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করুন।"

"পিকচারেক্স, পিকচারেক্স। আপনি স্যার নাটকের লাইনে এলেন না কেন?"

"ওই যে একটাই কারণ, কম বয়সেই মাথায় টাক পড়ে গেল।"

"কেন, পরচুল?"

"অ্যালার্জি। পরামাত্রই ফ্যাঁচ-ফোঁচ হাঁচি। হাঁচব, না, অভিনয় করব। যাক, এখন দেখা যাচ্ছে মিনিমাম তিনটে সিন লাগবে। না, না, না, তিনটেতে হবে না। চারটে লাগবে। লাস্ট সিন, লঙ্কা জ্বলছে। আকাশ লাল, দাউদাউ আগুন। সামনে রাবণবধ। হনুমানরা ধিতিংধিতিং নাচছে। আচ্ছা, সীতার পাতালপ্রবেশ হবে না?"

"না, স্যার! অতদূর আর টানছি না। কনডেন্স করে দিচ্ছি।"

"কনডেন্সড মিল্কের মতো! তবে কী জানেন, পাতালপ্রবেশটা দেখাবার খুব স্কোপ ছিল। স্টেজের একটা পাটাতন খুলে যেত, সীতা ঝপাং

করে নেমে যেত নীচে, আর সেই সময় স্টেজের তলায় রাখা ধুনুচি থেকে স্টেজের উপরে ভলভল করে ভেসে উঠত ধোঁয়া। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করুন। একটা স্কুল ড্রামায় এইরকম পাকা দৃশ্য অভূতপূর্ব!"

"কিন্তু আমরা যে স্যার রাবণবধেই ফিনিশ করে দিচ্ছি। ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়।"

"কেন কাহিনীটা আপনি ফ্ল্যাশব্যাকে টানতে পারেন। প্রথম দৃশ্যেই সীতা স্টেজের ফুটো দিয়ে তলায় পড়ে গেল। এইবার ধুনোর ধোঁয়ায় রামায়ণের ফ্রন্টপার্ট ভেসে উঠল। হেডমাস্টারমশাইয়ের চেয়ারে রাজা দশরথ। দশরথ, মনে করুন চোখ বুজিয়ে ঘুমোচ্ছে। দূতী গাইছে, জাগো দশরথ, জাগো, জাগো রামায়ণ। অ্যান্ড ইয়োর নাটক স্টার্টস। ব্যাপারটা গতানুগতিক হল না। একেবারে নতুন দৃষ্টিকোণ।"

"আপনার প্রস্তাব আমি অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব।"

"আরে মশাই, নতুন কিছু করুন, নতুন লাইনে ভাবুন। এটা জি টিভি, স্টার টিভির যুগ। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এমন কায়দার স্টেজ করিয়ে দেব, একেবারে ফার্স্ট সিনেই মারমার কাট-কাট।"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "আমার মনে হয়, আজকের মিটিং এইখানেই শেষ করা ভালো; কারণ অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে। সকলেরই অন্য কাজকর্ম আছে। আমাকে আবার মাদার ডেয়ারির দুধ আনতে হবে।"

"কেন, বাড়িতে আর কেউ নেই! ছেলেরা কী করছে?"

"বড়ো ছেলেটা ভাবুক। সে কবিতা-টবিতা লেখে। সংসারের কাজকর্ম তেমন ভালো লাগে না। ছোটোটা সন্ধের সময় তবলা শিখতে যায় ওস্তাদের কাছে।"

"তবলা! আর কিছু শেখার পেলে না!"

"তবলার এখন খুব ফিউচার। একটু নাম করতে পারলেই ইউরোপ, আমেরিকা। ওর গুরু এ-দেশে ক'মাস থাকে!"

"লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে?"

"না, তা কেন! লেখাপড়া আর তবলা একসঙ্গেই চলছে। আজকাল তো অ্যাকাডেমিক লাইনে কোনও চাকরি নেই। বড়ো ছেলেটার তো তাই

হল। এখন হতাশায় ভুগছে।"

"বেশ, আজকের মতো এই থাক। সামনের সপ্তাহে আবার আমরা বসব।"

মাস্টারমশাইরা উঠে পড়লেন। আমাদের মধ্যে থেকে শিবাঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "স্যার! কমিটির মধ্যে আমরাও আছি। আমাদের কিছু দায়িত্ব দেবেন। আমি খুব ভালো স্টেজ সাজাতে জানি। আমি ওই রাজপ্রাসাদ, জঙ্গল, সমুদ্র সব করে দেব। শুধু দু'এটা মেটিরিয়াল কিনে দিলেই হবে। এই যেমন, কাপড়, কাগজ, থার্মোকল, আঠা।"

সহপ্রধান বললেন, "সে তো ভালোই। তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিভা আমরা কাজে লাগাব।"

।।২।।

তিনদিন পরে বাংলারস্যার আমাদের নাটক কমিটির মিটিং ডাকলেন। নাটক লেখা শেষ। নাটক পড়া হবে। কে কোন ভূমিকা করবে, সেসব ঠিক হবে। স্কুল ছুটির পর আমরা হলঘরে সমবেত হলুম। স্যার এলেন। সবসময় তিনি ফিটফাট সেজে থাকেন। ফিনফিনে ধুতি, পাঞ্জাবি। শ্যাম্পুকরা ফুরফুরে চুল। খুব শৌখিন মানুষ। আমাদের খুব প্রিয় স্যার। বন্ধুর মতো মিশতে পারেন। হাসি, ঠাট্টা, মজা, সবই চলে। ভীষণ ভালো পড়ান।

স্যার বললেন, "বুঝলি, অ্যাসিস্ট্যান্ট এইচ এম-এর আইডিয়ায় জিনিসটা মন্দ দাঁড়াল না, এখন তোদের করার উপর সব নির্ভর করছে। প্রথম দৃশ্যে আমি একটু কায়দা করেছি। দেখ, রাম, রামায়ণ করতে-করতে আমরা বাল্মীকিকে প্রায় ভুলেই বসে আছি। সেই কারণেই আমি ফার্স্ট সিনে কবিকে টেনে এনেছি। এটা আমাদের কর্তব্য। ড্রপসিন উঠল। স্টেজ। বাঁ দিকে একটা বটগাছ। তলায় বসে আছেন বাল্মীকি। উপর থেকে তাঁর সামনে ধপাস করে পড়ল তীরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ। বাল্মীকি চোখ মেলে তাকালেন, মিউজিক, সঙ্গে সঙ্গে শ্লোক,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং
ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমধবীঃ
কাম মোহিতম্।।

এ কী! এ কী নির্গত হল আমার কণ্ঠ হতে! দৈববাণী, ঋষি! এর নাম কবিতা। পৃথিবীর প্রথম কবিতা। তুমি আদিকবি। এই দৈববাণীর সঙ্গেই আমি পাঞ্চ করে দিয়েছি রবীন্দ্রসঙ্গীত। সুযোগ যখন পেয়েছি, ছাড়ি কেন! আর তোদের মধ্যে যখন ট্যালেন্ট রয়েছে। কোরাস—

প্রথম আদি তব শক্তি—
তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে,

গানে মেন ভয়েস থাকবে মৃণালের। এই একটাই গান, এর পর আর গানের কোনও স্কোপ নেই। তোরা যে গানও গাইতে পারিস সেটা দেখাবি না! এইবার স্টেজে একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার ঘটবে। ঠিকমতো জমাতে পারলে তাক লেগে যাবে। স্টেজের তলা থেকে ধীরে-ধীরে সীতা জেগে উঠবে। মুকুট, কপাল, গলা, গোটা শরীর। ধোঁয়ার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে সীতার উত্থান। সীতা বাল্মীকির সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'কবি! তুমি আমার জীবন-কাহিনী লেখো। দেবী! তুমি কে? আমি সীতা, আমার প্রভু, শ্রীরামচন্দ্র। আমার কাহিনী লেখার শক্তি তোমাকে আমি দিয়ে গেলুম। তুমি অতীতে চলে যাও, দূর অতীতে, অযোধ্যা নগরীতে, রাজা দশরথের রাজসভায়।' এই কথা বলেই সীতা আবার স্টেজের ফুটো দিয়ে নীচে নেমে যাবে। ভলকে-ভলকে ধোঁয়া। ড্রপসিন।"

রাজা বলল, "স্যার! সীতাকে কেমন করে ওঠাবেন ওইভাবে?"

"আমার সঙ্গে রাজেনবাবুর কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন সীতাকে হাইড্রলিক প্রেসারে তুলে দেবেন।"

"সেটা কীরকম স্যার!"

"স্টেজের মাঝখানে একটা গোল গর্ত। গর্তের তলায় বিশাল একটা ড্রাম। ড্রামের ভেতরে মাপমতো গোল একটা বারকোশ। সীতা ড্রামে ঢুকে সেই বারকোশে দাঁড়াবে। ড্রামের একেবারে তলায় একটা ফুটো। সেখানে পাইপ। এইবার জল ঢোকানো হবে। জলের চাপে বারকোশ সমেত সীতা উপরদিকে ঠেলে উঠবে। অতি সহজ বিজ্ঞান।"

রাজা বলল, "স্যার, ওই বিজ্ঞানে কাজ হবে না। সীতার যা ওজন, ও বারকোশ-মারকোশ নিয়ে ওই ড্রামের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকবে। একটা ছোটো বল হলে ওই থিয়োরি খাটত। আপনি বিজ্ঞানেরস্যারের কথা শুনবেন

না।"

"তা হলে সীতা পাতাল থেকে উঠবে কী করে?"

"আমরা ঠেলে তুলে দেব। একটা তক্তা দুটো বাঁশে বেঁধে চারজনে মিলে চাগাড় দিয়ে তুলে দেব।"

"সীতা আবার পাতালে প্রবেশ করবে কীভাবে?'

"ও ওইটার উপরেই দাঁড়িয়ে থাকবে, আমরা আবার ধীরে-ধীরে নামিয়ে নেব।"

"অনেক সহজ হবে, তা না, তবে বিজ্ঞানটা বাদ গেল।"

"বিজ্ঞান বাদ যাক স্যার। গর্ত দিয়ে সীতা যদি না-ই উঠল, আমাদের নাটকটাই তো ভেস্তে যাবে। যে কায়দাটা বলছি, সেটাও খুব সহজ হবে না। রিহার্সাল দিতে হবে।"

"তা হলে প্ল্যানটা কি বাতিল করে দেব!"

"না, স্যার, জিনিসটা করতে পারলে দারুণ জমে যাবে। চেষ্টা করে দেখাই যাক না।"

"শিবাঞ্জন, তুই একটা বটগাছ সাপ্লাই করতে পারবি তো!"

"ওটা কোনও ব্যাপার নয় স্যার। পিসবোট কেটে খাড়া করে দেব। রংটং মাখিয়ে এমন করে দেব মনে হবে রিয়েল গাছ।"

"রাজপ্রাসাদের থাম কীভাবে করবি?"

"বাহাত্তর ইঞ্চি জলের পাইপ রাস্তার ধারে বেওয়ারিশ পড়ে আছে। দুটো এনে দুধারে খাড়া করে দেব।"

"পাগল হয়েছিস, স্টেজ ভেঙে পড়ে যাবে, আর কে তুলবে অত ভারী! ওই প্ল্যানটা ছাড়।"

"খুব রিয়ালিস্টিক হত।"

"রিয়ালিস্টিকের দরকার নেই। তুই ওই প্লাইউড কেটেই করে দিস। তবে ওই তিরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চটা একটু ভালো করে করিস। যেন বেশ জীবন্ত মনে হয়।"

"ওটা ভাবছি স্যার একটা সাদা মুরগিকে উপর থেকে ফেলে দেব।"

"মুরগি কী রে! ক্রৌঞ্চ মানে সাদা বক।"

"বক কোথায় পাব স্যার! কে আর বুঝবে বক কী মুরগি!"

"কী বলছিস, বকের স্ট্রাকচার আর মুরগির স্ট্রাকচার এক হল! তুই বাবা ওটা কাপড়টাপড় জড়িয়ে করে দিস। বকের গলা আর ঠ্যাং চোখে পড়ার মতো। ও মুরগি দিয়ে হবে না। এখন আমি পার্টগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দিই। বাল্মীকি হব আমি। সুরেশ, দশরথ।"

সুরেশ মাথা চুলকে বলল, "স্যার, আমার যে খুব রাম হওয়ার ইচ্ছে।"

"ইচ্ছে হলেই তো হবে না বাবা। তুমি যে একটু বেশি হৃষ্টপুষ্ট। তার উপর একটা ভুঁড়ি নামিয়েছ। রাম হব বললেই তো হওয়া যায় না! রাম হবে রাজেন।"

সুরেশ ছাড়ার পাত্র নয়। সুরেশ বলল, "দশরথ স্যার রোগা ছিলেন। খুবই অসুস্থ। পাণ্ডুর।"

"এই মরেছে, এ রামায়ণ-মহাভারত গুলিয়ে ফেলেছে। পাণ্ডুর ছিলেন পাণ্ডু রাজা। দশরথ ছিলেন লম্বা-চওড়া দশাসই মানুষ।"

"সে প্রথম দিকে ছিলেন, পরে ঢিবি হয়েছিল।'

"এসব তথ্য তুই কোথায় পেলি?"

'আমার নিজের ধারণা স্যার।"

"তোমার ধারণায় তো হবে না। দশরথ হতে তোর আপত্তি কীসের?

"মাত্র একটা সিন সার, তিনটে মাত্র ডায়লগ, রাম, তোমার ছোটো মায়ের ইচ্ছে, তুমি বনবাসে যাও। একটা অ্যাপিয়ারেন্স আর একটা কথার জন্য অত মেকআপ পোষাবে না স্যার, আমাকে তা হলে রাবণটা দিন।"

"অসম্ভব! রাবণের জন্য স্ট্রং অ্যাকটিং চাই। রাবণ হবে প্রসূন। ওর অভিনয় আমি দেখেছি। খুব ভালো। এ ক্লাস। রাবণের রোলে প্রসূন ছাড়া আর কাউকে ভাবাই যায় না!"

প্রসূন বলল, "স্যার, আমাকে রাম দিলেই ভালো হয়। রাবণ তো শেষকালে বধই হয়ে যাবে স্যার। রাম আমি খুব ভালো পারব স্যার। পাওয়ারফুল অ্যাকটিং।"

"রাম হয়ে নিজের সর্বনাশ নিজেই কেন করবি! রামের অ্যাকটিংই

নেই। কাঁধে ধনুর্বাণ নিয়ে কেবল ঘুরে বেড়ানো। চড়া কোনও ডায়লগই নেই। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, সার বেঁধে স্টেজে তিনপাক ঘুরবে। রাম কোনওকালেই তেমন স্ট্রং ছিল না। স্রেফ স্টাইল। হাঁটা, চলা, তাকানো। ধার্মিক মানুষের কি তেমন লম্ফঝম্প থাকে! রাম বনে যাও, বনে চলে গেল। গোটাকতক রাক্ষস খতম করল। সীতা বলল সোনার হরিণ ধরে দাও। সোনার হরিণ হয় না জেনেও পিছন-পিছন দৌড়ল। সারাটা জীবন তো দৌড়েই গেল। আসল খেল তো রাবণের। সীতা হরণের সময় তুই হাসির খেল দেখাবি, মারীচের নাক-কান কেটেছিলিস ভিখারি রাম। এইবার খেলাটা দ্যাখ তবে। সারা স্টেজ সর্বক্ষণ তুই-ই তো দাপিয়ে বেড়াবি। আমি লঙ্কেশ্বর রাবণ।"

মোটামুটি সব রোলই ঠিক হয়ে গেল। বানরসেনার সংখ্যা অনেক হবে। স্টেজ ভরে যাবে। তাদের মধ্যে বারোজনের লম্বা পাকানো লেজ থাকবে। লেজ তৈরি করবে শিবাঞ্জন। পেছন দিক থেকে মাথার উপর যেন উঁচিয়ে থাকে। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কীভাবে করবি? মাথার দিকে উলটে থাকা বাঁকা লেজ!"

শিবাঞ্জন বলল, "কতটা মোটা করব স্যার?"

"সাধারণ হনুমানের লেজ যেমন হয় আর কী! একটা হনুমান দেখে নিস না!"

"গাছের হনুমান আর রামায়ণের হনুমান কি এক হবে স্যার!"

"মোটামুটি একই হবে। ওরই মধ্যে একটু মোটা করে দিবি। বেশি মোটা করলে ছেলেরা কোমরে রাখতে পারবে না। তা হলে কী কায়দায় করবি?"

"মোটা তার কিনে আনব। তারপর খড় জড়াব, তার উপর লাল কাপড়।"

"কোমরে আটকাবে কী করে! তার একটা ব্যবস্থা রাখিস। টেকনিক্যাল দিকটা তোর দায়িত্ব। আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত রইলুম। কাল থেকে আমাদের রিহার্সাল।"

শিবাঞ্জন বলল, "এই টেকনিক্যাল ব্যাপারে তুই আমাকে একটু

সাহায্য করিস। তোর কারিগরি মাথাটা খুব একটা খারাপ নয়। আমি কি ভেবেছি বল তো, কাগজের পিলার তৈরি করব। মোটা কাগজ গোল করে জড়িয়ে-জড়িয়ে, তার উপর ময়দার লেই পরতে-পরতে। তার উপর পোস্টার কলার। সোনালি রঙের লতাপাতা। কেমন হবে?''

''হবে না। বাঁশের ফ্রেম ছাড়া ও-জিনিস দাঁড়াবে না। একটা স্ট্রাকচার চাই। এ তোর ধূপের প্যাকেট নয়!''

''তা হলে থাম আমি কী করে করব!''

''দায়িত্ব নেওয়ার সময় মনে ছিল না! গরম কচুরি খাওয়া নেপালদার দোকানের, তা হলে বলব।''

''ক-টা খাবি?''

''মিনিমাম চারটে, ম্যাক্সিমাম ছ-'টা।''

''দাঁড়া, লক্ষ্মীর ভাঁড় ভাঙি। বিকেলে শিওর খাওয়াব।''

বিকেলের দিকে নেপালদার দোকানে ফাটাফাটি ব্যাপার! হিংয়ের কচুরি কড়ায় ফুলছে। পাতলা বাদামি রং। পাশেই গামলাতে গোটা-গোটা মটরের ঝাল-ঝাল ঘুগনি। সেই কলতলা থেকেই গন্ধ পাওয়া যায়। শিবাঞ্জনই আমাকে এসে ডাকল, ''তোর একটা কোনও চাড় নেই! পড়ে-পড়ে বেলা পাঁচটা অবধি ঘুমোচ্ছিস! চল, চল।''

''ভাঁড় ভেঙেছিস?''

'হ্যাঁ, তিনটে নাগাদ। তক্কে-তক্কে ছিলুম। মা যেই ঘুমিয়েছে, প্যাঁচার মুণ্ডু উড়িয়ে দিলুম।''

''কতটা বেরোল?''

''নেহাত খারাপ নয়। সাতচল্লিশ টাকা ষাট পয়সা।''

''ভালোই জমেছে। তা হলে চ', কচুরির বদলে 'খাইখাই'-তে গিয়ে ব্রেস্ট কাটলেটে খাওয়া যাক। কাটলেটে বুদ্ধি আরও ভালো খোলে।''

ছ'টার সময় খাইখাই খোলে। বনেদি ব্যাপার। দরজার পাশে মালিক সিল্কের পাঞ্জাবি পরে ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে আছেন। দুপুরের ঘুমটা ভালোই হয়েছে। চোখমুখ ফোলা-ফোলা। খুব গম্ভীর চেহারা। আমরা ঢুকছি, একনজরে দেখে নিয়ে বললেন, ''সৎপথের পয়সা, না অসৎ পথের?''

শিবাঞ্জন যেন শুনতে পায়নি, বলল, "আজ্ঞে।"

"বলি, বাপের পকেট সাফ করেছ, না তাঁরা দিয়েছেন?"

শিবাঞ্জন একটু রাগের চোখে তাকিয়েছে। ভদ্রলোক বললেন, "বড়ো-বড়ো চোখে তাকালে কী হবে! এইরকমই আজকাল হচ্ছে। দেশের মরালটা তো একেবারে শেষ হয়ে গেছে। স্কুল, কলেজে তো আর এসব শেখানো হয় না। শেখানো হয়?" ভদ্রলোক ইয়া বড়ো-বড়ো চোখে শিবাঞ্জনের দিকে তাকালেন।

শিবাঞ্জন ছেলেটা এমনই খুব ভালো। সহজ, সরল। কোনও উপরচালাকি, ওস্তাদি এসব নেই। নিভাঁজ ভালো মানুষ। সেই তুলনায় আমি অনেক শয়তান। মনে জিলিপি-প্যাঁচ। নিজেকে খুব ওস্তাদ আর বুদ্ধিমান ভাবি। মাঝে-মাঝে দুঃখ হয়, আমি কেন শিবাঞ্জনের মতো হতে পারি না।

শিবাঞ্জন ভদ্রলোকের কথা শুনে কেমন যেন হয়ে গেল। একটু থমকে থেকে বলল, "আপনি যথার্থই বলেছেন। তবে আমরা ওসব করি না। যখন-তখন কাটলেটও খাই না। আজ লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙে সাতচল্লিশ টাকা পেয়েছি।"

"ভাঁড় ভর্তি হয়েছিল?"

"আজ্ঞে না।"

"তা হলে ভাঙলে কেন।"

"এই যে আমার বন্ধু পলাশ, ওর কাছ থেকে বুদ্ধি কিনতে হবে বলে ভাঁড়টা ভাঙতে হল।"

"খুবই রহস্যময় ব্যাপার! বুদ্ধি কিনতে হবে মানে? ওকে তুমি টাকা দেবে আর ও ওর মাথার ঢাকনা খুলে তোমাকে বুদ্ধি দেবে?"

"টাকা নয়, ওকে একজোড়া কাটলেট খাওয়ালে ও বলবে।"

"কী বলবে?"

"তা হলে আপনাকে সবটা বলতে হবে। গোড়া থেকে।"

"বলো শুনি। খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।"

শিবাঞ্জন সব বলল, "একজোড়া কাটলেট খাওয়ালে ও আমাকে বুদ্ধিটা দেবে।"

ভদ্রলোক বললেন, "অতিশয় ধরন্ধর ছেলে। তোমার বুদ্ধিটা শুনি।"

শিবাঞ্জন বলল, "ওকে ধুরন্ধর বলবেন না, ও ভীষণ ভালো ছেলে। আমার প্রাণের বন্ধু। ও পেটুক নয়। এমনই মজা করে বলেছিল।"

ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক আছে। ধুরন্ধর বলছি না। বলো হে ভালো ছেলে।"

"আজ্ঞে ভেবেছি, চারটে ছ'ফুট লম্বা মোটা রেনওয়াটার পাইপ কিনে স্টেজে খাড়া করে দেব। বেশ কালো চকচকে।"

"বুদ্ধিটা খারাপ নয়, কিন্তু খাড়া করবে কী করে!"

"চারটে বড়ো ফুলগাছের টবে মাটি দিয়ে পুঁতে দেব।"

'হবে না, হবে না, উলটে যাবে। আর-একটু ভাবো। বুদ্ধিটা যখন তোমার, তখন তুমিই আর-একটু খেলাও।" হঠাৎ ঝাঁ করে বুদ্ধিটা খেলে গেল, "... একটা কাজ করলে হয়। প্যান্ডেল তো হবেই, ওর মধ্যে বাঁশ পুরে একেবারে উপরের আড়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেব।"

"দ্যাট্স রাইট।' ভদ্রলোক ক্যাশ বাক্সের উপর একটা চাপড় মারলেন, "দ্যাট্স রাইট, আমিই তোমাদের কাটলেট খাওয়াব। যাও, ভেতরে গিয়ে বোসো। একটা কথা, হরেনদার নাম শুনেছ!"

"আজ্ঞে না।"

"সে কী, শ্যামপুকুরের বিখ্যাত সিন পেন্টার হরেন মিত্তিরের নাম শোনোনি! জমিদারের ছেলে ছিলেন। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেবেলা থেকেই ফ্যামিলির বাইরে। নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করেছেন। থিয়েটার ছিল ধ্যানজ্ঞান। বড়ো-বড়ো অভিনেতারা তাঁর স্টুডিয়োয় এসে বসে থাকতেন। নতুন নাটকের সিন বলতেন। হরেনদা এঁকে দিতেন। তাকিয়ে দেখার মতো সে-সব কাজ। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, আর আঁকতে পারেন না। তবে ভীষণ ভালো মানুষ। রামায়ণের কয়েকটা সিন এখনও আছে মনে হয়। যদি ধরতে পারো ফ্রি অফ কস্ট পেয়ে যাবে। হরেনদা আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, বুঝলে তো! তবে আমার নাম কোরো না। আমার উপর খুব রাগ। ওই যে আমি গানের লাইন ছেড়ে কাটলেটের লাইনে চলে এলুম। সে আবার আর-এক কাহিনী। পরে বলব। ইচ্ছে করলে একটা বই লিখতে পারবে। যাও,

ভেতরে গিয়ে বোসো। অ্যায়, মোধো!" ভদ্রলোক হাঁক পাড়লেন।

বেশ জমিয়ে, স্যালাড দিয়ে খোলতাই দুটো কাটলেট খাওয়া হল। ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে রাস্তায় নেমে শিবাঞ্জন বল, "চল না, হরেনবাবুর স্টুডিয়োটা খোঁজ করে যাই।"

"চল। আমার কোনও আপত্তি নেই।"

শ্যামপুকুরে এসে একটু খোঁজ করতেই, আর্ট স্টুডিয়ো, সিন পেন্টার অব রেপুট, প্রোঃ হরেন মিত্র, ইসটিডি— ১৯৩০ পাওয়া গেল। সাইনবোর্ডটা অস্পষ্ট। স্টুডিয়োর রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ। পাশের দিকের দরজা ঠেলামাত্রই খুলে গেল। সরু প্যাসেজ। দোতলার রেনওয়াটার পাইপ ঢাকা একটা নর্দমায় পড়েছে। আমরা ভয়ে-ভয়ে এগোচ্ছি। সিমেন্ট বাঁধানো পথ। হঠাৎ কাশির শব্দ। কাশতে-কাশতেই একজন প্রশ্ন করছেন, "কে? কাকে চাই?"

ডান পাশে ঘর। খোলা জানলা। এক বৃদ্ধ বসে আছেন। লম্বা-লম্বা সাদা চুল। দেখলেই মনে হচ্ছে শিল্পী। শিবাঞ্জন বলল, "জ্যাঠামশাই! আপনার কাছেই এসেছি।"

"আমার কাছে? আমার কাছে তোমাদের কী প্রয়োজন বাবা!"

"ভেতরে যাব?"

"এসেছ যখন, নিশ্চই আসবে। তবে কেন আসবে সেইটাই বুঝতে পারছি না।"

ভদ্রলোক কাশছেন। ঘরে কম পাওয়ারের আলো। চাদরপাতা চৌকি। তার উপর শিল্পী বসে আছেন। মেঝের উপর একটা আলবোলা। নলটা খাটের পাশে। দুটো বেতের মোড়া। ঘরের ডান পাশের দেওয়ালটা পুরো ঢাকা। সেখানে একটা সিন। নীল আকাশ। বন। একটা সোনালি হরিণ ছুটে পালাচ্ছে।

শিবাঞ্জন মোড়ায় বসতে যাচ্ছিল। "মারীচ, পলাশ, মারীচ," বলে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল। প্যাঁক করে একটা শব্দ। শিবাঞ্জন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠল। দেখছে, শব্দটা হল কোথায়! মেঝেতে একটা পুতুল পড়ে ছিল।

ভদ্রলোক বললেন, "ওটা আমার নাতনির। তোমাদের ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না। পাগল নাকি!"

শিবাঞ্জন ছুটে এসে ভদ্রলোকের পা জড়িয়ে ধরল, "শিল্পী, শিল্পী, উঃ, আপনি শিল্পী!"

ভদ্রলোক বললেন, "দেখো, কামড়ে-টামড়ে দিয়ো না যেন। শান্ত হও, শান্ত হও।"

শিবাঞ্জন কেঁদে ফেলেছে। আমিও সিনটা দেখছি, তবে আমার অত আবেগ আসছে না। আমি ঘোর বিষয়ী। দুর্দান্ত আঁকা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মানুষ যে কী করে এমন আঁকে!

ভদ্রলোক বলছেন, "আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি কাঁদছ কেন?"

শিবাঞ্জন কথা বলবে কী, সে তো কেবল ফ্যাঁসফ্যাঁস করছে। আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিলুম, "জানেন তো, ও ভীষণ ভালো ছবি আঁকে, দুর্দান্ত ভালো ওর হাতের কাজ, তাই ও আপনার প্রতিভা দেখে আবেগ চাপতে পারছে না। ভাবছে, ও কেন আপনার মতো হতে পারছে না!"

বৃদ্ধ এইবার একটু হাসলেন, "সে কী, এখনও এমন ছেলে এই শহরে আছে নাকি! এত সূক্ষ্ম মনের ছেলে! এ তো বহুদূর যাবে। মনে হচ্ছে জীবনে খুব বড়ো হবে। টাকাপয়সা হয়তো হবে না, তবে একটা মানুষের মতো মানুষ হবে! তা তোমরা এই পরিত্যক্ত বৃদ্ধের কাছে হঠাৎ এলে কী মনে করে! সন্ধানই বা পেলে কার কাছে?"

শিবাঞ্জন একটু সামলাতে পেরেছে, সে-ই বলল, "আমরা জুবিলি স্কুলের ছাত্র।"

"জুবিলি! জুবিলি ওয়াজ মাই স্কুল। ও কী আজকের স্কুল! ওয়ান অব দ্য বেস্ট স্কুল্‌স ইন বেঙ্গল। তোমরা সেই স্কুলের ছাত্র! তার মানে, বার্ড্‌স অব এ ফেদার। দেখি, ওই কৌটোটা আনো। অন দ্য টপ অব দ্যাট ড্রয়ার।"

শিবাঞ্জনই এগিয়ে গেল। ঘরটা বেশ বড়ো। একেবারে শেষ মাথায় একটা দেরাজ। তার উপর সুদৃশ্য একটা কৌটো। কৌটোটা এনে বৃদ্ধের হাতে দিল। তিনি কৌটো খুলে একমুঠো লজেন্স বের করলেন। কোনওটা

হালকা কমলালেবু রংএের, কোনওটা পিঙ্ক, কোনওটার রং ডিপ চকোলেট। শিবাঞ্জনের হাতে দিয়ে বললেন, "ভাগ করে নাও।" নিজে একটা নিলেন।

মোড়ক খুলে মুখে পুরে বললেন, "খুব সুন্দর, টেস্ট করে দ্যাখো, যে-কোনও দোকানে পাবে না! স্পেশ্যাল।"

ভদ্রলোকের মুঠোয় এগারোটা লজেন্স উঠেছিল, শিবাঞ্জন পাঁচটা রেখে ছ'টা আমাকে দিলেন।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কি, সমান ভাগ হয়েছে?"

শিবাঞ্জন চুপ করে আছে দেখে আমি বললুম, "হয়নি স্যার, ও পাঁচটা রেখে ছটা আমাকে দিয়েছে।"

কিছুক্ষণ শিবাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তোমার পরিচয় জানি না, কিন্তু এইটা বুঝতে পারছি, তুমি খুব ভালো বংশের ছেলে, তোমার সংস্কার খুব ভালো। তুমি জীবনে অনেক বড়ো হতে পারবে। তোমার ভেতর ক্ষুদ্রতা নেই। আচ্ছা বলো তো, কেন তোমরা এসেছ?"

শিবাঞ্জনই বলল, "আমাদের স্কুলের ফাংশান। আমরা থিয়েটার করছি রাবণবধ। আমাদের তো তেমন পয়সা নেই, তাই স্টেজটা ঠিকমতো করতে পারছি না। আপনার কাছে আগের আঁকা কিছু সিন থাকতে পারে ভেবে এসেছি। যদি আপনি অনুগ্রহ করে দেন!"

"রাবণবধ! তা হ্যাঁ রামায়ণে কিছু সিন তো আমার গোডাউনে থাকার কথা। তেমন যত্নে নেই। হয়তো ধুলো পড়েছে। ইঁদুরে একটু কাটতেকুটতেও পারে। তা হলেও তোমাদের কাজ চলে যাবে।"

শিবাঞ্জন প্রায় লাফিয়ে ওঠে আর কী, "অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ আছে?"

"থাকার তো কথা! সেবার খুব যত্ন করেই এঁকেছিলুম।"

"অরণ্য?"

"অরণ্য তো থাকবেই। চিত্রকূট পাহাড়।"

"সমুদ্র? হনুমান মেরেছে লাফ।"

"সমুদ্র আছে। হনুমান তো নেই।"

"ঠিক আছে, হনুমান ছাড়াই হবে। লঙ্কা আছে?"

"অবশ্যই আছে। লঙ্কায় অগ্নিকাণ্ড আছে।"

যতই শুনছে, শিবাঞ্জন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, "অরণ্যে সীতার কুটির। রাবণ যেখান থেকে ধরেছিল?"

"সেটা না থাকলে রামায়ণের থাকলটা কী? ওইটাই তো রামায়ণের কেন্দ্রবিন্দু।"

শিবাঞ্জনের আবেগ এসেছে, আবার চোখ ছলছলে। কথা আটকে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কীভাবে পাব?"

"দ্যাখো বাবা, আমি অথর্ব। এক-পাও হাঁটতে পারি না। আগামীকাল বহরমপুর থেকে আমার ম্যানেজার গুপি আসবে। গুপি তোমাদের নিয়ে যাবে গ্রে স্ট্রিটের গোডাউনে। তোমরা সেইখান থেকে তোমাদের লোক দিয়ে বের করে নেবে। প্রথমে নরম বুরুশ দিয়ে আগাপাশতলা ঝাড়বে। যদি দ্যাখো, খুব ময়লা হয়েছে, তা হলে সাবানজলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে একটু মুছে নেবে। তোমাদের একটু খাটতে হবে। পারবে তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা খুব খাটতে পারি।"

"ভেরি গুড, তা হলে এসো। এইবার আমি শুয়ে পড়ব। বয়েস হয়েছে তো, সন্ধের মুখেই ঘুমটা ধরতে না পারলে, ট্রেন বেরিয়ে যাবে, আমি সারারাত প্ল্যাটফর্মেই পড়ে থাকব একা।"

আমরা নমস্কার করে বেরিয়ে এলুম। শিবাঞ্জন নাচছে। "দেখেছিস, ভগবান আছেন। যা চাইছি তাই পেয়ে যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে। চল খাই খাই-এর ভদ্রলোককে বলে আসি। ভাগ্যিস তুই কচুরির বদলে কাটলেট খেতে চাইলি। এখনও কত ভালো লোক বেঁচে আছেন বল?"

"আগের মানুষরা বেশিরভাগই ভালো।"

খাই খাই-তে তখন রাতের ভিড় লেগে গেছে। দপাদ্দপ কাটলেট উড়ে যাচ্ছে। স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা আহত মানুষের মতো লম্বা-লম্বা ফিশফ্রাই প্লেটে চেপে রান্নাঘর থেকে সোজা চলে যাচ্ছে খদ্দেরদের টেবিলে। বয়রা সব মাকুর মতো ছোটাছুটি করছে। নামতা পড়ার মতো একঘেয়ে সুরে বলে যাচ্ছে, তিন নম্বরে ফিশফ্রাই, একটা ডবল হাফ। পাঁচ নম্বরে, একটা কবিরাজি।

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন, "কী হল আবার?"

শিবাঞ্জন বলল, "আপনার কথায় খুব কাজ হয়েছে। সেই কথাটাই জানাতে এলুম।"

"হবেই তো, হবেই তো! একেবারে দিলদরিয়া মানুষ। তা, তোমাদের লেখাপড়া নেই, এখনও বাইরে-বাইরে ঘুরছ?"

"না, আমাদের তো পরীক্ষা হয়ে গেছে।"

"হয়ে গেলেও, তোমাদের বয়সে সন্ধের পর বাইরে থাকা উচিত নয়। পড়ার বই ছাড়াও অন্য অনেক বই আছে, যা তোমরা এই সময় পড়ে ফেলতে পারো। এই সময়টাকে কাজে লাগাও। পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি কী বলো তো? সময়। আমরা সেই কোন ছেলেবেলায় পড়েছিলুম, টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান্।"

আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম। শিবাঞ্জন বলল, "কথাটা উনি ঠিকই বলেছেন। আমরা এখনও অতটা বড়ো হইনি যে, রাত আটটা পর্যন্ত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরব। দেখেছিস পলাশ, সব ভালো মানুষের মধ্যেই একজন করে শিক্ষক বসে আছেন। চল, বাংলারস্যারকে সুখবরটা দিয়েই আমরা বাড়ি চলে যাই।"

স্যার তাঁর বাড়ির সামনের রকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পায়চারি করছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, "কী রে! তোরা দুটোতে এত রাতে!"

"আপনি স্যার এখানে ঘোরাঘুরি করছেন?"

"কী করব বলো, দরজায় তালা দিয়ে আমার স্ত্রী চলে গেছেন। এই একঘণ্টায় আমার প্রায় চার মাইল হাঁটা হয়ে গেল। তোমাদের কী খবর বলো!"

"একটা ভীষণ সুখবর এনেছি স্যার। আমরা প্রায় সমস্ত দৃশ্যের সিন পেয়ে গেছি।"

"সে কী! আঁকা সিন?"

"হ্যাঁ স্যার, আঁকা সিন। অসাধারণ সুন্দর।"

শিবাঞ্জন পুরো অভিযানের একটা বর্ণনা দিল। স্যার একবার এপাশ থেকে ওপাশ যাচ্ছেন, আমরাও যাচ্ছি পেছন-পেছন। তিনি ওপাশ থেকে

এপাশে আসছেন, আমরাও আসছি। অনেকটা লেজের মতো। সব শুনে তিনি বললেন, "এই পৃথিবীর সমস্ত আবিষ্কারই প্রায় অ্যাক্সিডেন্ট! তোমার ওই এক্সরেই বলো আর পেনিসিলিনই বলো।" পলাশ বলল, "খাওয়াতে হবে। কী খাওয়াতে হবে, না কচুরি। হঠাৎ মতের পরিবর্তন — কাটলেট খাব। সেই কাটলেট থেকে এই আবিষ্কার। এর নাম লাক।"

"কালই তোমরা সিনগুলো এনে স্কুলের হলঘরে ডাম্প করে ফ্যালো। শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কাল হরণম্। একদম দেরি কোরো না।"

স্যারের স্ত্রী চটির ফটাস-ফটাস শব্দ তুলে এলেন। হাতে একটা বাজারের থলে। তাঁকে দেখেই স্যার আমাদের বললেন, "তোমরা যাও। আমার রক্ত চড়ছে। এখন ধুম ঝগড়া হবে। তোমাদের না শোনাই ভালো।"

আমরা লাফিয়ে রাস্তায়। শুনতে পেলুম তিনি চিৎকার করে বলছেন, "এতক্ষণ ছিলে কোথায়?"

ঠিক সেইরকম জোরেই উত্তর, "যমের বাড়ি।"

শিবাঞ্জন আপন মনে বলল, "ঠিকই করে ফেলেছি, জীবনে বিয়ে করব না। বিয়ে মানেই অশান্তি।"

"ঠিক বলেছিস! আমি তো ঠিক করেছি, সারাজীবন ছাত্রই থাকব।"

"মানে কী, প্রত্যেক বছর ফেল করবি!"

"তা কেন, একের পর এক পাস করে যাব, এম এ, এল এল বি, ডি লিট, ডি ফিল, আবার এম এ। চালিয়েই যাব, চালিয়েই যাব।"

"আমি পেন্টার হব। ছবির পর ছবি এঁকে যাব।"

"টাকা?"

"ও ম্যানেজ হয়ে যাবে। খুব কম খাব। খাটিয়াতে শোব। পায়ে হেঁটে সবজায়গায় ঘুরব। একটা-দুটো ছবি নিশ্চয় বিক্রি হবে। খুব কষ্ট করব। কষ্ট করলে মানুষ খাঁটি হয়। দেখবি সব পশুর মধ্যে বলদ আর গাধাই সৎ।"

"কেন, কুকুর?"

"নিজেদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া করে।"

"ঘোড়া?"

"ঘোড়ার খুব ডাঁট। অহঙ্কারী। বড়োলোকরা পিঠে চাপে তো!"

"পাখি?"

"অমিশুক। মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় না। উড়ে পালায়।"

"মাছ?"

"মানুষের লোভ জাগায়।"

শিবাঞ্জন আর আমি এক পাড়ায় থাকি। শিবাঞ্জনদের বাড়ির একতলায় একঘর ভাড়াটে আছে। ভদ্রলোক পোস্টাপিসে চাকরি করেন। অবসর পেলেই তাঁর কাজ হল শিবাঞ্জনদের সঙ্গে ঝগড়া করা। সকাল, বিকেল, সন্ধে, সবসময় ঝগড়া। শুনতে পাচ্ছি, আজও হচ্ছে।

শিবাঞ্জন থেমে পড়ল, "বাড়ি যাব কী না ভাবছি রে পলাশ?"

"এখন আর কোথায় যাবি এত রাতে বাড়ি ছাড়া!"

"যতক্ষণ না ঘুমোচ্ছে ততক্ষণই তো চালাবে।"

"তোরা চুপ করে গেলেই তো পারিস।"

"মা শুনবে না, সমানে চালিয়ে যাবে।"

"কী নিয়ে হয়?"

"কোনও ঠিক নেই, যা হয় একটা কিছু নিয়ে বেঁধে গেলেই হল। কাল হচ্ছিল আরশোলা নিয়ে। দোতলার আরশোলা কেন একতলায় নেমেছে?"

"তা তোরা কী করবি?"

"আমরা কেন আরশোলা কন্ট্রোল করছি না!"

আমাদের বাড়িতে এই সময় একটা কাণ্ড হয়। সেটা হল দিদির গলা সাধা। উচ্চাঙ্গ শিখছে। তানের ঠেলায় পাড়া কাঁপছে। সবাই বলে মারাত্মক গায়। আমার ভেতরটা কেমন যেন অস্থির অস্থির করে। গলগল করে তান বেরোচ্ছে। সে আর থামে না। আমিও বাড়ি ঢুকব কিনা ভাবছি। শেষে দু'জনেই ঢুকলুম।

এই সময় আরও একটা কাণ্ড হয় আমাদের পাড়ায়। সেটা হল আমতলায় যে বস্তি আছে, সেইখানকার একটা ছেলে বলা নেই কওয়া নেই, অকারণে দুমদাম করে পটকা ফাটাতে থাকে। তার বাবা নাকি বাজির

কারখানায় কাজ করেন। সেই পটকার আওয়াজও শুরু হয়ে গেল। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় আমার দিদিটাকে হারমোনিয়াম সমেত শিবাঞ্জনদের বাড়ির দোতলার দক্ষিণের ঘরে বসিয়ে দিয়ে এলে হয়। ওদিকে ঝগড়া, এদিকে তেড়ে-তোড়ে মাপা, ধাপা, গামা, মাগা। হয়তো একদিন তাই হবে, কারণ যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে, শিবাঞ্জনের দাদার সঙ্গে আমার দিদির বিয়ে হবে। দু'জনের নাকি খুব ভাব হয়েছে। মা গয়না-টয়না সব গড়াতে শুরু করেছে। বাবা বলে, শিবাঞ্জনের দাদা নীলাঞ্জন ফার্স্টক্লাস ছেলে, জেম অব এ বয়। অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো পেয়ে এসেছে সব পরীক্ষায়। আমি বিয়ে-টিয়ে বুঝি না। আমি বুঝি খাওয়া। ফিশ ফ্রাই, ফিশ রোল, মাটন চাঁপ। ঘুরব, ফিরব, গপাগপ খাব। দিদি ভাইফোঁটায় আমাকে জামা-প্যান্ট দেবে।

।। ৩।।

আমাদের স্কুলের নিউ হলে আজ নাটকের মহলা।

বাংলারসার নির্মলবাবু মাঝখানে বসেছেন স্ক্রিপ্ট হাতে। হাতে পেন্সিল। কোন-কোন জায়গায় এফেক্ট মিউজিক ঢুকবে, সেইসব ঠিক করবেন। চরিত্রদের প্রবেশ, প্রস্থান। ছেলেদের আর আসল নামে এখন ডাকছেন না। বলছেন, "রাম কই, রাবণ কোথায়, সীতাকে কান ধরে মাঠ থেকে টেনে আন। জাম্বুবানের ঠাণ্ডা লেগে তিনটেই একসঙ্গে হয়েছে। সর্দি, কাশি, জ্বর। একটা খদ্দরের চাদর মুড়ি দিয়ে কোণে বসে ক্রমান্বয়ে কেশে চলেছে।"

স্যার বলছেন, "মানুষমাত্রেরই কাশি হয়, কিন্তু সে-কাশিতে একটা কমা, ফুলস্টপ থাকে। এইরকম ননস্টপ কাশি খুব কম দেখেছি। এত ইরিটেশান হচ্ছে, মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে, রাবণবধের বদলে, হনুমানবধ করে ফেলি।"

রাবণ বলল, "স্যার, হবে না কেন কাশি! কাল দুপুরে আমাদের ছাতে বসে তেঁতুলের আচার খেয়েছে।"

"তেঁতুল!" স্যার আঁতকে উঠলেন, "একে রোদে রক্ষে নেই তার উপর তেঁতুল। তেঁতুল এল কোথা থেকে?"

রাবণ বলল, "মা বাসন মাজার জন্যে আনিয়েছিল, ও দুপুরে এল। রোজই আসে। মা ওকে খুব খাতির করে তো!"

স্যার খুব রেগে গেলেন, "আই ওয়ার্ন ইউ। টেলিভিশনের ল্যাঙ্গোয়েজ ব্যবহার করবে না।"

রাবণ বলল, "টেলিভিশন নয় স্যার। আমরা তো ইউ পি-তে ছিলুম, তাই কিছু হিন্দি ঢুকেছে।"

জাম্বুবান কাশতে-কাশতে বললে, "স্যার, আমি জানতুম না, তেঁতুলের সন্ধানটা ও-ই দিয়েছিল, বললে, মা ঘুমোচ্ছে। চল এই ফাঁকে তেঁতুলটা সাবাড় করি।"

রাবণ বললে, "স্যার, তেল, লঙ্কা আর চিনি দিয়ে জিনিসটা ও-ই তৈরি করেছিল। আমাকে একটুখানি দিয়ে সবটা নিজেই সাবড়ে দিল।"

"এটা তোর চক্রান্ত। তুই আগেই রামকে উইক করে দিতে চাইছিস। হনুমান অসুস্থ হলে তোরই তো পোয়াবারো।"

রাবণ হতাশ হয়ে বলল, "রামায়ণ তো আগেই লেখা হয়ে গেছে স্যার, আমি যাই করি না কেন, আমাকে মরতেই হবে, নতুন রামায়ণ তো লেখা হবে না।"

স্যার আর-এক প্রস্থ রেগে গিয়ে বললেন, "জাম্বুবানকে ঘর থেকে বের করে দাও। কেশো হনুমান আমি চাই না। বাড়িতে গিয়ে নুনজলের গার্গল কর। থ্রোট পেন্ট লাগা। তেঁতুলের আচারে যার লোভ, সে কোনওদিন পারফেক্ট হনুমান হতে পারে না। ইমপসিব্‌ল। রামায়ণে এমন কোনও দৃষ্টান্ত নেই।"

জাম্বুবান কাশতে-কাশতে নিজেই দরজার দিকে এগোচ্ছে, স্যার একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, "কালকের মধ্যে তোর কাশি না সারলে হনুমানের লিস্ট থেকে তোর নাম কাটা যাবে।"

জাম্বুবান মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল। স্যার এইবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা যদি এ-ক'দিন একটু সংযমে থাকতে না পারো, আমি নাটক বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।"

আমরা সবাই সমস্বরে বললুম, "ইয়েস স্যার।"

"খুব লাইট ঝোল-ভাত খাবে। ঝোলে গাঁদালপাতা দিতে বলবে। যখন-তখন চান করবে না। দই, টক খাবে না। চানাচুর, ফুচকা ছোঁবে না।

রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়বে।"

"ইয়েস স্যার।"

"আচ্ছা, এইবার সব হনুমান একপাশে ফল-ইন করো।"

বারোটা হনুমান একপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

"তোমাদের আমি সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করাব। সামরিক বাহিনীতে যদি ডিসিপ্লিনের অভাব হয় যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব! আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। রামের সামনে তোমরা যখন প্রথমে আসবে, তখন তোমরা হাতজোড় করে রামের বন্দনা গাইবে। তখন তোমাদের লেজ মাটির দিকে নিচু হয়ে থাকবে। পয়েন্টিং ডাউনওয়ার্ডস।"

শিবাঞ্জন বলল, "সেটা কী করে হবে স্যার! লেজগুলো তো ওদের অরিজিন্যাল নয়। আমি তো সব মাথা-ওঁচানো লেজ করছি।"

"সে আমি জানি না। করতেই হবে। ভগবান মাথা দিয়েছেন, মাথা খাটাও।"

হনুমানরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, মানুষরা বসে-বসে মাথা খাটাতে লাগল। শিবাঞ্জন বলতে গিয়েছিল, "স্যার একমাত্র বেড়ালের লেজ আপ অ্যান্ড ডাউন করে।" এক দাবড়ানি, "তোর কোনও অবজারভেশন নেই। মানুষ হয়ে হনুমানের মর্ম বুঝবি কী! হনুমানের লেজ যেমন লতিয়ে থাকে, সেইরকম খাড়া হয়ে মাথার দিকেও উঠে যায়। হ্যান্ডপাম্পের হাতলের মতো। একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের যে-কোনও অ্যাঙ্গেলেও ওঠানামা করে।"

শেষে একজন হনুমানের মাথা থেকেই বুদ্ধিটা বেরুল।

"স্যার হবে।"

"কী হবে?"

"লেজ অধোমুখ হবে। আমরা প্রথমে লেজটা ঘুরিয়ে পড়ব। বাঁকা দিকটা মাটির দিকে ফেরানো থাকবে। পরে সেইটা ঘুরে যাবে মাথার দিকে, পরার কায়দায়।"

স্যার লাফিয়ে উঠলেন, "আঃ দেখেছ, ঠিক বের করে ফেলেছে সমাধান। এই না হলে হনুমান! আচ্ছা, আমরা তা হলে বন্দনাটা ঝালিয়ে নিই। সুর করে আমার সঙ্গে বলো, হাত জোড় করে —

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্।।
জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকম্।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্।।

এই দুটো স্তবক আগে হোক। হনুমানদের মধ্যে কে একজন 'স স' করছে। হনুমানের স-এর দোষ থাকে না। স-এর উচ্চারণ ঠিকমতো করো, নয়তো নাম কেটে দেব। সুর যেন ঠিক থাকে। সুরট মল্লার। আবার বলো, রিপিট, ভজে বিশেষসুন্দরং। আবার বলছি, বিশেস নয় বিশেষ, বিশেষ। সমস্তপাপখন্ডনম্। শমস্ত নয়, স স, সমস্ত, সমস্ত। কে একজন গাঁক-গাঁক করে গাধার মতো চেল্লাচ্ছে। মনে রাখো, হনুমান স্তোত্রপাঠ করছে। গাধা নয়। হনুমানের দলে গাধার কোনও স্থান নেই।"

সে এক হিমশিম অবস্থা! একটাও সুরেলা হনুমান নেই। যাই হোক, হনুমানদের প্যারেড শুরু হল। লেফ্‌ট রাইট, রাম সীতা, রাম সীতা, অ্যাবাউট টার্ন। হল্ট । স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ। আবার লেফ্‌ট রাইট।

শিবাঞ্জন হঠাৎ বলে বসল, "প্যারেড হবে না সার।"

"কেন? কেন হবে না। হওয়ালেই হবে।"

"তা হলে সব হনুমানকে বেঁড়ে হতে হবে। লেজ থাকলে চলবে না। এক-একটা হনুমানের পেছনে মিনিমাম দু' থেকে তিন ফুট ক্লিয়ারেন্স রাখতে হবে লেজের বাঁকের জন্যে। সেটা কি সম্ভব হবে।"

স্যার একটু চিন্তায় পড়লেন। শিবাঞ্জন ধরেছে ঠিক। আবার এক সমস্যা।

স্যার বললেন, "ঠিক বলেছিস! আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ স্যার?"

"সাঁওতালি নৃত্যের মতো, হনুমানরা সার বেঁধে সামনে এগিয়ে যাবে, মাথা নিচু করে আবার পেছিয়ে আসবে। মাথা যখন নিচু করবে, মাথার উপরে লেজটা নেচে উঠবে। কী বলিস, আইডিয়াটা কেমন?"

শিবাঞ্জন বলল, "খুব ভালো। পিকচারেস্ক।"

"তা হলে সেইভাবেই হোক। হনুমান্‌স গেট রেডি। সামনে এগোও, মাথা নিচু, পেছিয়ে এসো। মাথা তোলো, আবার এগোও। মাথা নিচু, মাথা নিচু। পেছোও।"

এই চলল বেশ কিছুক্ষণ। হনুমানরা ঘর্মাক্ত।

স্যার বললেন, "এইবার বিশ্রাম তোমাদের, এইবার আমি মেন ক্যারেক্টারদের নিয়ে পড়ি। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রাবণ এগিয়ে এসো।"

রিহার্সালের পরেই স্কুলের মাঠে সীতার সঙ্গে রাবণের এক হাত খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। রাবণ তিন-চারদিন ধরেই সীতার সঙ্গে ঠুসঠাস চালাচ্ছিল, "তোকে আমি হরণ করব। আমার অশোক কাননে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখব। রামকে মেরে তোকে শিক্ষা দেব। সীতা দেবী তোকে কে রক্ষা করবে! ম্যায় হুঁ, ম্যায় হুঁ, ম্যায় হুঁ রাবণ।" মাঝে মাঝে মাথায় গাট্টা-টাট্টাও মারছিল। রিহার্সালের পর মাঠে নেমে, যেই 'সীতা দেবী', বলে হাত ধরেছে অমনই সীতা দেবী সোজা ঝেড়ে দিয়েছে এক ঘুসি রাবণের চোয়ালে। সীতা মারামারিতে ওস্তাদ। হালকা শরীর। কিছুদিন ক্যারাটে শিখেছিল। রাবণটা গোদা। নড়তেচড়তেই পারে না। সীতা পাকা বক্সারের কায়দায় ঝড়াঝড় এক রাউন্ড ঘুসি ঝেড়ে দিল। প্রায় দশ-বারোটা। রাবণের ঠোঁট কেটে গেছে। আমরা সবাই মিলে ছাড়িয়ে দিলুম।

শিবাঞ্জন বলল, "এই সীতাকে রাবণ হরণ করবে কী করে! এই তো রাবণকে হরণ করে নিয়ে যাবে। এ তো ইচ্ছে করলে রামকেও ফ্ল্যাট করে দিতে পারে।"

আমাদের সীতার অনেক গুণ। লেখাপড়ায় ভীষণ ভালো। ভালো ফুটবলার। ফরওয়ার্ডে খেলে। বিদ্যুৎগতিতে লেফ্‌ট উইং দিয়ে ছোটে। ফাঁক পেলেই জোর শটে বল জড়িয়ে দেয় নেটে। সীতা আমাদের স্কুল টিমের নাম্বার ওয়ান স্কোরার। সেই সীতাকে রাবণ গেছে খোঁচাতে। বাল্মীকির ব্যাকিং না থাকলে পারবে সীতা হরণ করতে! রাবণ সেই কথাটা বুঝে কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে সোজা বাড়ি চলে গেল।

রাম আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সে শুধু লেখাপড়া নিয়েই থাকে। চোখ দুটো বড়ো-বড়ো। বেশ লম্বা। সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না। ঠাকুরদা নামকরা পণ্ডিত। বয়স প্রায় নব্বই। টকটকে ফরসা, ঋজু চেহারা।

এখনও সোজা হাঁটেন। নিজে রান্না করে খান। কেউ তাঁর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। রামের মধ্যেও সেইরকম একটা সাত্ত্বিক, তেজী ভাব। ভীষণ সিরিয়াস। এই রামের ওই সীতা, ভাবাই যায় না! স্যারের যেমন নির্বাচন!

শিবাঞ্জন বলল, "দেখবি, এই হয়ে রইল। অভিনয়ের রাতে কী হবে কে জানে!"

পরের দিন সকালে হেডস্যার আর অ্যাসিস্ট্যান্টস্যার প্যান্ডেল, স্টেজ আর তোরণ নিয়ে পড়লেন। "তোরণ ইজ এ মাস্ট হোয়েন রাজ্যপাল ইজ কামিং।" এই কথাটা সহপ্রধান পানঠাসা মুখে বারেবারেই বলতে লাগলেন। আর হেডস্যার কেবলই বলছেন, "পিকটা ফেলে আসুন না। এনি মোমেন্ট ওভারফ্লো করবে।"

বাংলারস্যার একটা নকশা হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন। চক দিয়ে লিখছেন, অশ্বত্থগাছ, সীতার পাতাল প্রবেশের স্পট। হনুমান ব্যালকনি। দশরথের চেয়ার।

এইসব হচ্ছে দেখে আমি আর শিবাঞ্জন গেলুম সিন আনতে। হরেনদা স্নান সেরেছেন। বাবরিচুল বেশ পাটে-পাটে আঁচড়ানো। খাটে বসে আছেন হাতজোড় করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে ধূপ জ্বলছে। সুন্দর, মিষ্টি গন্ধ। আমরা দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি ধ্যান করছেন। নিথর শরীর। একসময় চোখ খুললেন। চোখ দুটো যেন সমুদ্রে স্নান করে উঠল। ঠাকুরের ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমাদের দিকে তাকালেন। চিনতে পেরেছেন, "অ, তোমরা এসেছ! বেশ করেছ। বোসো। আমি গুপেকে ডাকি।"

হাতের কাছে একটা পেতলের ঘণ্টা। তিনবার নাড়লেন।

একটা ঝড় এসে ঢুকল ঘরে। পরদা ফেঁড়ে ঘরে একজন এলেন। পালোয়ানের মতো চেহারা। পরনে গামছা। গোটা শরীর তেলে চপচপ করছে। হরেনবাবু অবাক, "এ কী, তেল মেখে কী হচ্ছে?"

"তেলটা মাখতে বাধ্য হলুম। এখন আমার তেল মাখার কথা নয়। আমি তেল মাখব আরও এক ঘণ্টা পরে।"

"তাহলে মাখলে কেন?"

"মাখতে বাধ্য হলুম। টিন থেকে তেল ঢালতে গেলুম শিশিতে। ধার কাটল না, পড়ে গেল মেঝেতে। অতটা তেল নষ্ট হবে, তাই মেখেই নিলুম।"

"কতটা ফেললে?"

"তা পোয়াটাক।"

"সরষের তেলের দাম জানো?"

"জানি বলেই তো কষ্ট করে মাখতে হল।"

"সেই ছেলে দুটি এসেছে, যাও গোডাউনে নিয়ে যাও।"

"এখন এই অবস্থায় যাব কী করে! চান করব। চান করলেই খিদে পাবে। ভাত খাব। ভাত খেলেই ঘুম পাবে। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোব। উঠতে-উঠতে বিকেল। তার মানে আজ আর হল না। সেই কাল।"

শিবাঞ্জন প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি, "কাল হলে হবে না স্যার। সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

হরেনবাবু আশ্বস্ত করলেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও উতলা হওয়ার কিছু নেই। লোকটার স্বভাবই এইরকম। সব কাজেই প্রথমে না করবে, তারপরে তেল-টেল মাখালে হ্যাঁ হবে। জাত বাঙালি।"

হরেনবাবু গলাটা নরম করে বললেন, "হ্যাঁ রে সত্যিই হবে না! ছেলে দুটো এত আশা নিয়ে এল। ধর তোকে যদি একটা কিছু উপহার দিই, তা হলে!"

"সেটা আমাকে তা হলে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে, কী উপহার, কেমন উপহার।"

"ধর এক কেজি ভালো রাবড়ি, মোহনের দোকানের।"

"তা হলে ঝাঁ করে আমি দু' বালতি, বালতি তিনেকও হতে পারে জল ঢেলে আসি। টাকাটা অ্যাডভান্স হবে কী?"

"কথা ইজ কথা। হাতি কা দাঁত, মরদ কা বাত।"

হরেনবাবু বললেন, "ও আসতে-আসতে তোমাদের একটা স্কেচ করে ফেলি। তোমরা বসো যেমন বসে আছ। বুঝলে, আর্টিস্টের হাত

সবসময় চালু রাখতে হয়, ফেলে রাখলেই জং ধরে যায়। আর স্কেচ তুমি যত স্পিডে করতে পারবে, ততই লাইন ভালো আসবে, ফ্লোয়িং লাইন্‌স। এইট বি পেনসিল, মোটা কাগজ।"

আমরা বসে আছি, হরেনবাবু ঘচঘচ পেনসিল চালাচ্ছেন। দশ মিনিটও লাগল না। আমরা কাগজে ধরা পড়ে গেলুম। শিবাঞ্জন খাটের ধারে উঠে গেছে। এইসব দেখলে তার খুব উত্তেজনা হয়। পাগলের মতো হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করছে, "আগে কোন দিকটা ধরলেন?"

"আগে-পরে নেই। সবটাই একসঙ্গে। তুমি যখন সমুদ্র দ্যাখো, তখন কীভাবে দ্যাখো?"

"ঢেউ দেখি, একের পর এক।"

"নো, শুধু ঢেউ দ্যাখো না, তুমি প্রথমে দ্যাখো নীল আসমান, জমিন, সব নীলে নীল, সেইখানে দ্যাখো একের পর এক ঢেউ আর সাদা ফেনা। আর দ্যাখো হলুদ বালি। এইবার ওইখানে যদি কিছু লোক, ধরো জলে কী সৈকতে বসে আছে, তুমি আর্টিস্ট, তুমি কোনটা দেখবে! তোমাকে সবটা একসঙ্গে দেখতে হবে। খুব ভালো শিল্পী সমুদ্রের ফনফনে বাতাসটাও দেখবে। বাতাস তো দেখা যায় না, অনুভব করা যায়, বাতাসের অ্যাকশান দেখা যায়, চুলে, পোশাকে, ছিটিয়ে পড়া ঢেউয়ের ফেনায়। আর ঢেউই তো বাতাস। বড়ো ঢেউ, ছোটো ঢেউ, রিপল্‌স। একেই বলে সমগ্র দর্শন। সাধকেরও ওই এক কথা। স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে এক করে দ্যাখো। যা নুড়ি, তাই পাথর, তা-ই পর্বত।"

হরেনবাবু শিবাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। গুপিবাবু একেবারে ফিটফাট হয়ে ঘরে এলেন। হরেনবাবু বললেন, "আবার সেই তেলটা মাথায় মেখেছিস গুপি। আমাকে এইবার বাড়িছাড়া করবি! তোমরা একটা গন্ধ পাচ্ছ না! হ্যাঁ গা, একটা ছারপোকা-ছারপোকা গন্ধ!"

আমি হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিলুম, শিবাঞ্জন আমার হাতে চিমটি কাটল। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে গেলুম কী বলতে চাইছে। গুপিবাবু গোলমেলে, একবগ্‌গা লোক। হাতে রাখতে হবে। তাই চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

গুপিবাবু বললেন, "তোমার আর কী! একমাথা চুল। আমার যে ক'গাছা আছে, তাও তো সব ভুস-ভুস করে উঠে যাচ্ছে।"

"ওরে মূর্খ! ওই দুর্গন্ধী কবিরাজি তেলে যে টাক পড়ে যাবে গবেট! উঃ এই গন্ধটা আমার অসহ্য লাগে।"

"এটা কীসের গন্ধ জানো! জেসমিন, জেসমিন।"

"তোর মুণ্ডু। জেসমিন আমার কাছে আছে। শুঁকে দেখিস।'

"তোমার জেসমিন কী জানি না। আমার জেসমিন এইটা।"

গুপিদা উত্তেজিতভাবে আমাদের বললেন, "তোমাদের কী চাই?"

সেরেছে! সিন বুঝি আর কপালে জুটল না! শিবাঞ্জন মিষ্টিগলায় বললে, "সবে চান করেছেন, পিত্তি পড়বে। চলুন, ঘোষমশাইতে বসে একজোড়া চমচম খাবেন।"

"বাঃ, অতিশয় স্নেহপ্রবণ ভদ্রসন্তান! এ-ছেলে দেশের, দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। মনুমেন্টের মাথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে। কলকাতার দুঃখমোচন করবে। চলো, চলো। পিত্তাধিক্যে শরীর বিকল হয়।"

রাস্তায় বেরিয়ে দু'পা হাঁটতে-না-হাঁটতেই শিবাঞ্জনের সঙ্গে গুপিবাবুর গলায়গলায় ভাব হয়ে গেল। ঘোষমশাইতে আমাদের গোটাদশের টাকা খরচ হল। সে আর কী করা যাবে! গোডাউন বটে একখানা। কী নেই সেখানে! বাঘ-ভালুক ছাড়া সবই আছে। সে এক সিন!

শিবাঞ্জন বলল, "ঘাবড়াবার কিছু নেই। মানুষ সমুদ্রের অতল থেকে জাহাজের মালপত্র তুলে আনছে, আর আমরা ডাঙা থেকে রামায়ণের সিন বের করে আনতে পারব না!"

গুপিদা তালা খুলে দিয়ে উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবার গুনগুন করে গান গাইছিলেন, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। শেষে কী মনে হল, বললেন, "সরো দেখি, কী করা যায়! আছে, সে তো আমিও জানি। এখন শুয়ে আছে, না খাড়া আছে!" গোটাকতক প্যাকিং বাক্স টপকে ভেতরে চলে গেলেন। সেইখান থেকে শোনা গেল, "ওঃ, দুটো চমচমের কী ঠেলা বাবা! দয়া করে ভেতরে এসো না! জামাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে।'

আমি জিজ্ঞেস করছি, 'যাব গুপিদা!"

সঙ্গে-সঙ্গে খিঁচিয়ে উত্তর, "আসবে না তো কী! আমি একাই সার্কাস করব! দুটো চমচমে অত হয় না!"

শিবাঞ্জন বলল, "কেন, সন্ধেবেলা এক কেজি রাবড়ি! চমচম তো ভূমিকা।"

ভেতরে হুড়মাড় করে কীসব পড়ে গেল। গুপিদার সাড়াশব্দ নেই। মরে গেল নাকি! বাক্স-টাক্স টপকে দু'জনে ভেতরে গেল। গুপিদা সিন চাপা পড়ে গেছে। মুণ্ডুটা বেরিয়ে আছে।

শিবাঞ্জন বল, "কী গো গুপিদা!"

গুপিদা বলছে, ক্ষীণস্বরে, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। রাবড়ি লোভে আজ জীবনটা গেল।"

"জীবন যাবে কেন, আমরা তোমাকে তুলছি দাদা!'

"তোদের ক্ষমতায় কুলোবে না রে চম। একসঙ্গে তিনটে ঘাড়ে পড়েছে।"

সত্যিই সে এক ভজঘট ব্যাপার। এক-একটার কম ওজন। তার উপর ওই ঢাউস সাইজ। যাই হোক প্রায় আধ ঘণ্টার মতো কসরত করে মানুষটাকে বের করা গেল। ফিটফাট বাবুটি আর নেই। ঝুলকালি-মাখা ভূত।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, "নাও, এইবার সিন দ্যাখো। অবস্থাটা একবার দেখেছ। এত জায়গায় আগুন লাগে, এই হতচ্ছাড়া গুদোমে লাগে না কেন! নাও, হাত লাগাও। এই চারটে হল রামায়ণের সিন।"

"আর ওই পাশের ওইগুলো!"

"শাহজাহান। তার ওপাশে চাণক্য। এইসব শিশিরবাবুর জন্যে আঁকা হয়েছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম শুনেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ভেরি গুড়, তিনি আমার গুরু ছিলেন। তাঁর কাছেই আমার সব শিক্ষা।"

"আপনি অভিনয় করতেন গুপিদা!"

"অভিনয় অতি তুচ্ছ জিনিস, আমি তার চেয়ে বড়ো কাজ করতুম। প্রত্যেকটা সিনের শেষে চা খাওয়াতুম। চা খাওয়াতুম বলে আমার কত

আদর ছিল! তাই তো গুরু আমাকে সন্ধি করে বলতেন, গুরু বলতেন তুই আমাদের চা দিস তাই আমরা এনার্জি পাই, তুই চাদর। পুরনো কথা বলতে বসলে দিন খতম হয়ে যাবে। যাও, একটা টেম্পো কী দু'জন লোক ভাড়া করে আনো। ফিরে গিয়ে আমাকে আবার ওস্তাদের জন্যে রান্না চাপাতে হবে। আজ আবার শখ হয়েছে মৌরলা মাছ ভাজা খাবেন।"

সেই দুপুর দেড়টা থেকে শুরু হয়েছে, হ্যালো, হ্যালো, মাইক্রোফোন টেস্টিং, ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর। আজই আমাদের অনুষ্ঠান। তোরণ তৈরি হয়ে গেছে। তার মাথায় থার্মোকল কেটে শিবাঞ্জন লিখেছে, স্বাগত, মাননীয় রাজ্যপাল। তলার দিকে দু'পাশে খাড়া করে আটকেছে দুটো কাটআউট। দুটো মেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে। নিজের বন্ধু বলে বলছি না, কাজ দুটো ভীষণ ভালো হয়েছে। প্রধানশিক্ষক পিঠ চাপড়ে বলেছেন, সুপার্ব!

মঞ্চ রেড়ি। মাঝখানে বাংলারস্যার দাঁড়িয়ে তদারকি করছেন। পাশে সহপ্রধান। রাজ্যপাল আসছেন, সেই কারণেই চুল কেটেছেন। সে যা হয়েছে! যেন ঘাস ছাঁট। তাঁরা দু'জনে সীতার গর্ত তৈরি করাচ্ছেন। সহপ্রধান মিস্ত্রিকে বলছেন, "আরে রাস্তার ম্যানহোল দ্যাখোনি! এগজ্যাক্টলি সেই কায়দা।"

মিস্ত্রি বলছেন। "গোলটোল হবে না, চারচৌকো হতে পারে।"

বাংলারস্যার বলছেন, "আরে তাই হোক না।"

"বেশ, আমি করে দিচ্ছি, তবে পরে আপনারা বিপদে পড়বেন। সব ভণ্ডুল করবে ওই গর্ত? স্টেজের তলাটা কেমন, কোনও ধারণা আছে বাবু! খোঁটা আছে কম-সে-কম সত্তরটা। বড়জোর একটা কুকুর ঢুকতে পারে। আপনি বলছেন একটা ডালা নিয়ে চারটে ছেলে ঢুকবে, তার উপর আবার আর-একটা ছেলে। জিন্দিগিতে এমন থিয়েটার শুনিনি। নাটকটা কি সিঁদেল চোরের কাহিনী!"

"শুনবে কী করে! তুমি যে বাবু পুরনো কালেই পড়ে আছ। স্টেজক্র্যাফ্ট কোথায় এগিয়েছে জানো? আমেরিকা স্টেজে হেলিকপ্টার নামাচ্ছে।"

"এটা আমেরিকা নয়, ইংল্যান্ড নয়, ইন্ডিয়া। এ-দেশে এখনও রিকশা চলে। মানুষ গামছা পরে ঘুরে বেড়ায়।"

সহপ্রধান আর বাংলারস্যার দু'জনে মিলে মঞ্চের তলাটা দেখতে গেলেন, সঙ্গে আমি আর শিবাঞ্জন। সহপ্রধান দেখেই বললেন, "অসম্ভব! প্ল্যান বাতিল। রামায়ণে সীতার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে, ফের, এগেন এই অত্যাচার করাটা মানবিক কারণেই অনুচিত। কেমন করে একটা ট্রলি এই খোঁটার জঙ্গলে ঢুকবে! চারপাশে গজালের মতো বড়ো-বড়ো পেরেক। প্ল্যান পালটান, প্ল্যান পালটান। সীতা কী শেষে যিশু খ্রিষ্ট হয়ে ঝুলবে!"

"আপনারই প্ল্যান, লাস্ট মোমেন্টে আপনিই চেঞ্জ করছেন। আর ওই প্রথম দৃশ্যটার উপর দাঁড়িয়ে আছে গোটা নাটকটা।"

"আরে মশাই, নাটকটা তো দাঁড়িয়ে আছে, আপনার সীতা কোথায় দাঁড়াবে! এক হয়, পাতাল আর স্বর্গ যদি স্থান পরিবর্তন করে। পাতালটা মনে করুন উপরে, স্টেজের মাথায়, আকাশে। সেখান থেকে দড়ি বেঁধে সীতাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল।"

"অ্যাবসার্ড! আপনি আপনার সুবিধে দেখছেন, ভাষার দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না! আকাশ মানে আকাশ। মানে গগন, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, শূন্য, আ যুক্ত কাশ ধাতুর অ (ধি)। আর পাতাল মানে, পুরাণোক্ত ত্রিভুবনের সর্বনিম্নস্থ ভুবন, নাগলোক, পৃথিবীর অধোদেশস্থ ভুবন, ভূগর্ভ। অভিধানের এই অর্থ বদলে আকাশকে পাতালে, পাতালকে আকাশে পাঠানো যায়! ব্যাকরণ ইজ ব্যাকরণ!"

হঠাৎ পেছনে প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের গলায় আমরা চমকে উঠেছি, "মাস্টারমশাই, আপনি নাটক লিখেছেন না ব্যাকরণ! ছি ছি, বড়ো মানুষের এ কী আচরণ! মশাই, উপরে কত কাজ এখনও বাকি, আর আপনারা দু'জন রেসপনসিবল মানুষ এখানে ধাতুরূপ শব্দরূপ করছেন! অভাবনীয়। ওসব ছেলে-ছোকরাদের হাতে ছেড়ে দিন।"

হেডমাস্টারমশাই গটমট করে চলে গেলেন। আমরা সবাই অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। এরই মাঝে শিবাঞ্জন, "ইউরেকা" বলে লাফিয়ে উঠেই মাথার হাত দিয়ে বসে পড়ল, "উরে বাবা।" মাথার উপর বাঁশ, খেয়াল করেনি।

"জল দে, জলদি জল দে," বলে সহপ্রধানের চিৎকার।

শিবাঞ্জন সামলে নিয়ে বল, "স্যার, তেমন লাগেনি। মাথার মাঝখানটা সুড়সুড় করছে। মনে হয় একটু রক্ত বেরিয়েছে, এখনই জমে যাবে। শুভকাজে একটু রক্তপাত ভালো স্যার।"

"তা, তুমি বাবা অমন লাফিয়ে উঠলে, কারণটা কী!'

"স্টেজে ম্যানহোল করতে হবে না স্যার, আমার মাথায় অন্য আইডিয়া এসেছে।"

"বলো না, বলো না।" স্যার কেমন যেন হয়ে গেলেন। যাকে বলে অভিভূত।

শিবাঞ্জন দুষ্টু-দুষ্টু হেসে বলল, "সে দেখবেন, যখন হবে চমকে যাবেন।"

হেডমাস্টারমশাই হাতজোড় করে বললেন, "শুধু নিজেদের ফাংশানটাও একটু উদ্ধার করতে তো হবে! আই রিকোয়েস্ট।"

সহপ্রধান আবার মুখে পান ঠুসেছেন, তার উপর ছেড়েছেন তিন টিপ জর্দা। সেই অবস্থায় কিছু একটা বলতে চাইলেন। প্রধানশিক্ষক দু'হাত তুলে বাধা দিলেন, "থাক, থাক, আর কিছু শুনেত চাই না। আমি বুঝে গেছি, বুঝে গেছি। একেই বলে অন্তর্ঘাত। একটা দিন, মাত্র একটা দিনের জন্যে আপনার এই বদঅভ্যাসটা বন্ধ রাখতে পারছেন না! জাস্ট ফর এ ফিউ আওয়ার্স। গভর্নরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন, মুখে পান জর্দা, হাতে পানের বোঁটায় চুন। হোয়াট এ সিন!"

সহপ্রধান একপাশে হেলে প্যাঁক করে খানিক পানের পিক ফেলে বললেন, "বাঃ, এরই মধ্যে ফাংশানটাকে ফেঁড়ে ফেললেন দু'ভাগে, আমার তোমার! এটা কিন্তু আপনিই করলেন, আমরা করিনি। আমরা এই যে তলায় এসেছি, এটা একটা টেকনিক্যাল কারণে, অকারণে আসিনি স্যার।"

হেডমাস্টারমশাই ইশারা করে দেখালেন, সহপ্রধানের পাঞ্জাবির বুকে একফোঁটা পানের পিক লেগেছে।

সহপ্রধান একবার দেখে নিয়ে বললেন, "এই বাজারে একটু লালের স্পট থাকা ভালো। ওটা হল রক্ষাকবচ। আচ্ছা, এইবার চলুন, ওদিকটা দেখা যাক্। নির্মলবাবু চলে আসুন।"

ওঁরা চলে যেতেই শিবাঞ্জনকে বললুম, "তোর আবিষ্কারটা কী শুনি?"

"একবার বাড়িতে যেতে হবে, চল আমার সঙ্গে।"

শিবাঞ্জনদের বাড়ি স্কুলের খুব কাছেই। শিবাঞ্জন আমাকে নিয়ে তরতর করে চিলেকোঠায় চলে এল। সেইখান থেকে দু'জনে টেনেটুনে বিশাল বড়ো একটা কাগজের বাক্স বের করলুম। বাক্সটা বেশ শক্তপোক্ত। একসময় টিভি এসেছিল।

শিবাঞ্জন বলল, "ভেতরে বোস তো।"

বসলুম। মাধার চাঁদিটা জেগে রইল।

শিবাঞ্জন বলল, "মাথাটা নিচু কর।"

নিচু করলুম। শিবাঞ্জন বলল, "হবে। ফাসক্লাশ হবে। সামনের দিকটায় কালো কাগজ মেরে দিই।" বাক্স নিয়ে যখন ফিরে এলুম, স্টেজ তখন রেডি। লাল কার্পেট, সাদা চাদর ঢাকা লম্বা টেবিল। সাদা-সাদা চেয়ার। দুটো ফুলদান, সুন্দর তোড়া। পেছনে ভেলভেটের পরদা। তার উপর শিবাঞ্জনের আর্ট, সাদা একটা রাজহাঁস, একটা বীণা। একটা পদ্ম, একেবারে ফেটে গেছে। রাজ্যপাল যেদিক দিয়ে উঠবেন সেদিকে রেলিং লাগানো বেশ শক্ত সিঁড়ি।

মঞ্চের ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রথমে সিঁড়ি। আমাদের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক খুব মোটা। তিনি বারবার উঠছেন, নামছেন। ধপাস-ধপাস করে। দু-চারবার করে বললেন, "নাঃ কোনও ভয় নেই। আমি ইজিকলটু চারটা সাধারণ লোক। রাজ্যপালের চেহারা সাধারণ চেহারা, কোনও ভয় নেই।"

হেডমাস্টারমশাই মেয়েদের ডাকলেন। তিরিশজন। সকলকেই মঞ্চে তোলা হল।

সহপ্রধান বললেন, "জাম্প।"

তারা লাফাচ্ছে। হেডমাস্টারমশাই বললেন, "টেস্ট করতে গিয়ে খোলনলচে খুলে পড়ে না যায়!" বলতে-না-বলতেই ফুলদানি দুটো উলটে পড়ে গেল।

সহপ্রধান বললেন, "নুইসেন্স। আমি আগেই বলেছিলুম, যে-কোনও সভা পণ্ড করার পক্ষে গোটা দুই ফুলদানিই যথেষ্ট। অ্যায়, এই দুটোকে ঘাড় ধরে মঞ্চ থেকে বিদায় কর। আমি যে বলেছিলুম টেবিলের মাঝখানে একটা ইকেবানা ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখতে। সেটা কই! শিবাঞ্জন!"

"ভুলে গেছি স্যার!"

"ভুললে তো চলবে না স্যার। এখনই এক ঘণ্টা সময় আছে, করে ফ্যালো। তোমার প্রতিভা আছে। রাজ্যপালের সামনে সেই প্রতিভা প্লেস করো।"

বেচারা শিবাঞ্জন আর পারছে না। জিজ্ঞেস করল, "কীসে করব স্যার?"

"আমার মাথায়, আমার খুলিতে।" যত সময় এগিয়ে আসছে, ততই সকলের টেম্পার চড়ছে। শিবাঞ্জন আবার লাফিয়ে উঠল, "ইউরেকা।" মৃদুলা কুঁক-কুঁক করে হেসে উঠল। ফার্স্টক্লাসে পড়ে মৃদুলা। লেখাপড়ায় যেমন ভালো, তেমনই ভালো নাচে— গায়? মৃদুলা শিবাঞ্জনাকে ভালোবাসে। আমরা সবাই জানি। শিবাঞ্জন জানে না! সে নিজের খেয়ালেই বনবন ঘোরে। শিল্পীরা মনে হয় এইরকমই হয়। শিবাঞ্জন গ্রাহ্যই করল না। এক লাফে নেমে গেল মঞ্চ থেকে। ছুটল বাড়িতে। সেখান থেকে নিয়ে এল বিশাল বড়ো একটা ঝিনুকের খোলা। জিনিসটা আন্দামানের। আধ ঘন্টার মধ্যে সে একটা কাজ নামাল, হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মতো।

তখনও কিন্তু শাঁখের রিহার্সাল চলছে। ওয়ান-টু-থ্রি, পোঁ।

সহপ্রধান পরিচালনা করছেন, "হল না, হল না। তিনটে পোঁ করেনি, ফোঁ করেছে।"

রিহার্সাল শেষ হওয়ার পর ফাঁক পেয়ে মৃদুলা শিবাঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়াল, "কী দারুণ করেছিস রে!"

আমার খুব হিংসে হচ্ছে বাংলারস্যার দাবড়ানি দিলেন, "তাতে তোমার কী! ওর মাথাটা খারাপ করে দিয়ো না মা। এখনও অনেক কাজ বাকি। দয়া করে এসো এখন। আমাদের শ্রাদ্ধটা হয়ে যাক।"

ঠিক পাঁচটায় গভর্নর আসবেন। সাড়ে চারটে বাজল। প্রধানশিক্ষক

সমস্ত দিক একবার ঘুরে দেখে এলেন। হেঁ, মনে হচ্ছে নিখুঁত। কোথাও কোনও ত্রুটি তো চোখে পড়ছে না। তোরণ থেকে গেট সব ঝাড়ু দিয়ে ধুয়েমুছে ঝকঝকে, তকতকে। দুটো বড়ো গর্ত, সে গর্ত আজ পনেরো বছর ধরেই আছে। সারানো হবে না। বলা হল, গভর্নর আসছেন, যদি একটু তাপ্পিতুপ্পি মেরে দেন। তাতে রাস্তা মেরামত দফতরের বড়োকর্তা বললেন, "ওসব নকশা আমাকে দেখাবেন না। আজকাল একটা কায়দা হয়েছে, যে-কোনও ছেঁচড়া অনুষ্ঠানে গভর্নরকে ধরে আনা। চালাকিটা আমরা বুঝি। আসল উদ্দেশ্যটা হল, ওই ছুতোয় রাস্তাটা মেরামত করিয়ে নেওয়া। আমরা ধরে ফেলেছি ভাই। গভর্নর বড়ো রাস্তা ছেড়ে গলিঘুঁজিতে ঢুকতে চাইলে আমরা কী করতে পারি!"

ওই গর্ত দুটো আমরাই রাবিশ ঢেলে পিটিয়ে যা হয় একরকম করেছি। একপাশে একটা ময়লার ভ্যাট। সরাল না কিছুতেই। আমরা লাল শালু দিয়ে সেটাকে ঢেকেছি। সেখানে আবার শিবাঞ্জন সাদা অক্ষরে লিখেছে, বর্ণমালাই ভগবান। সেই জায়গাটা দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্গন্ধ লাগবেই। উপায়। পাশেই একটা বাড়ি। সেই বাড়ির মাসিমার রান্না অসাধারণ। ডালে যখন ফোড়ন দেন, তখন গোটা পাড়াটাই ম-ম করে। সহপ্রধান মাসিমাকে বলে এসেছেন, যেই ক্লাবের ব্যান্ড, ঢ্যাম্প-ঢ্যাম্প করে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে উনুনে কড়া, তেল, ফোড়ন, ছ্যাঁ করে জল ঢালা। দুটো জানলাই যেন খোলা থাকে।

সিকিউরিটি অফিসার সব দেখে নিলেন। স্টেজের তলায় পোঁটলামতো কী একটা ঝুলছিল। সেই নিয়ে অশান্তি। মেটাল ডিটেকটার আনা হল। শেষকালে ছুরি দিয়ে কাটা হল। পানের খিলি আর জর্দার কৌটো। ছুটে এলেন সহপ্রধান, "মশাই, সামান্য একটা জিনিস, হেডমাস্টারমশাইয়ের ভয়ে ওই তলায় লুকিয়ে রেখেছি, তাও শান্তি নেই। জীবনে বোমা দেখেছেন! দেখে থাকলে এটাকে বোমা ভাবতে পারতন না। আর যদি নরম তুলতুলে ন্যাকড়ার বোমাই হত, তাতে চালালেন ছুরি। কী বুদ্ধি!"

সিকিউরিটি অফিসার বললেন, "সেকেলে বুদ্ধি নিয়ে একেলে টেররিস্ট ধরতে হলে আপনার কবে চাকরি চলে যেত! আর. ডি. এক্স. জানেন কাকে বলে! ট্যাঁকে ট্যাঁকে থাকে আধুলির মতো। একটা ঘষা, এই

প্যান্ডেল-ফ্যান্ডেল, গ্রাম-ট্রাম সব উড়ে যাবে।"

হঠাৎ ড্রামের আওয়াজ, ডুডুডুম, ড্রাম ড্রাম। আরে, এসে গেলে নাকি?

সবাই হুড়মাড় করে দৌড়লেন, দেখা গেল কিছুই নয়, শুভাশিস ড্রামের চার্জে, সে একবার দেখে নিচ্ছে যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক মেজাজে আছে কি না। হেডমাস্টারমশাই একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন, মুখ দেখেই বোঝা গেল; কিন্তু অসহায়! সবাই রিহার্সাল দিচ্ছে, শুভাশিসও দেবে। বাধা দিলে চলবে না।

এই সময় সহপ্রধান মনে করিয়ে দিলেন, "শাঁখের সঙ্গে গান হবে বলেছিলেন, শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।"

"রাজ্যপালকে জননী বলা যায় না।"

"তা হলে জননীর জায়গায় জনক বসিয়ে দিন।"

"ছন্দ মিলবে না।"

"হ্যাঁ, তাও তো বটে! তা হলে একটা কাজ করুন, গায়ে তো ফুল ছুড়ে মারা হবে, সেই সময় যদি গাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের গান :

পুষ্প দিয়ে মারো যারে চিনল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে।।

হেডমাস্টারমশাই আঁতকে উঠে বললেন, "আমাকে জেলে পাঠাতে চান। রাজ্যপালকে বাণ মার! কোনও গানের প্রয়োজন নেই, কেবল শাঁখ আর ব্যান্ড। তাইতেই দেখবেন ব্লাড প্রেশার টু ফর্টি। গেট রেড। আর মাত্র টেন মিনিট্স। রাজ্যপালকে আপনি রিসিভ করবেন।"

"তা হলে এই দশ মিনিটে ঝপ করে আমি একটা পান খেয়ে নিই।"

"প্লিজ হেমন্তবাবু, ওই কাজটা আপনি করবন না। আমি বড়ো হয়েও আপনার পায়ে ধরছি।"

স্কুলের গেটে ওসি। এক ব্যাটেলিয়ান পুলিশের লাইন আপ। ওসির কানে ওয়াকিটকি। তিনি আওয়াজ দিলেন, "আসছেন?" আর ঠিক সেই সময় বেপাড়ার একটা কুকুর এল কী হচ্ছে দেখতে। সঙ্গে-সঙ্গে স্কুলের গেট

ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আমাদের বিগ ভোলা। বিদ্যুৎবেগে। নিমেষে ঝটাপটি। মেয়েরা লাইন ভেঙে চিল-চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারল দৌড়ল। শিবাঞ্জন চেঁচাচ্ছে, "আমার গেট, আমার গেট।" গেটের দু'পাশের ঘট রাস্তায় গড়াচ্ছে। ধুন্ধুমার মারামারি। ওসি চিৎকার করছেন, "চার্জ, চার্জ, ফায়ার, টিয়ারগ্যাস।" সেই মূহূর্তে দূরে শোনা গেল, সাইরেন, ওঁয়া ওঁয়া। সহপ্রধান বললেন, "সর্বনাশ! রাজ্যপাল আ গিয়া।"

পুলিশের বেধড়ক লাঠি চার্জ। কুকুর দুটোর একটানা কেঁউ কেঁউ। রাজ্যপাল নামলেন। প্রধানশিক্ষক অর্ডার দিলেন, শঙ্খ, স্টার্ট শঙ্খ। শঙ্খধারিণীরা যে যেখানে ছিল, সেইখান থেকেই শাঁখ বাজাতে লাগল। শুভাশিসের ব্যান্ড, ধ্যাপ্‌পড়, ধ্যাপ্‌পড়। মেয়েরা নেই। প্রধানশিক্ষকই পুষ্পবৃষ্টি করছেন। কলাগাছ সমেত ঘট রাস্তায় শুয়ে আছে। সহপ্রধান এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে, হাতজোড় করে বলছেন, "স্বাগতম, স্বাগতম, ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, ফর্চুনেট উই আর দ্যাট ইউ হ্যাভ কাম। ওয়েলকাম, ওয়েলকাম।"

সহপ্রধানের জন্য রাজ্যপাল এগোতে পারছেন না। তিনি কেবল বলছেন, "থ্যাঙ্কস, থ্যাঙ্কস।"

শেষে সিকিউরিটির একজন, এক ধাক্কা মেরে সহপ্রধানকে পাশে সরিয়ে দিলেন। রাজ্যপাল ধীরে-ধীরে মঞ্চে উঠে সিংহাসন চেয়ারে বসলেন। বাংলারস্যার মাইক্রোফোনের সামনে। স্বাগত ভাষণ, "আজ আমাদের ..." মাইক্রোফোনের নিজের ভাষায় নিজের কিছু বলার ছিল, "চ্যাঁ চোঁ, সিঁ, কোঁড়র কোঁত।"

যাঁরা সামনের আসন ছিলেন চিৎকার করে উঠলেন, "মাইক, মাইক।"

ওপাশ থেকে আওয়াজ এল, "টয়লেটে।"

বাংলার শিক্ষক অসহায়। আবার চেষ্টা, "আজ ...।"

এবারে মাইক্রোফোন ক্ষিপ্ত, "চোঁও ও চোঁক।"

স্যার বললেন, "ইমপসিব্‌ল।"

মাইক বললে, "ভোঁচ।"

এমন সময় মাইকম্যান এল। সবাই বলে তেএঁটে রিশে। মাইক

ঠিক হল। স্যার শুরু করলেন, "আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন। এই সুপ্রাচীন বিদ্যালয়ে প্রথম এক রাজ্যপাল এলেন। আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা ধন্য, আমরা অভিভূত, আমরা উচ্ছ্বসিত, আমরা বাক্যাহত।"

হেডমাস্টারমশাই ইশারা করছেন, আর না, আর না।

শেষে সহপ্রধান স্টেজে সাতটা বাচ্চা মেয়ে নামিয়ে দিলেন। ফুটফুটে সুন্দর, প্রত্যেকের হাতে মালা। তারা নেচে-নেচে আসছে। পেছনে বসে গান গাইছেন উমাদির দল-

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির পরে
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে।।

গানের সুরে আদেশ এল, "বড়ো মালাটা পরিয়ে দাও।" কুচো ফুলের বৃষ্টি। অমিতা নাচতে-নাচতে গিয়ে মালা পরাল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপুস ঝুপুস গোলাপের পাপড়ি বর্ষণ। আবার গান—

নয়ন তোমার নত করে,
দলগুলি কাঁপে থরোথরো।
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো, ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়
ধরার প্রণাম আমি

গানের আদেশ সুরে "ওয়ান বাই ওয়ান, প্লেস ইয়োর মালা অন হিজ হাইনেসেস ফিট। নেচে নেচে, তিক তিক, তেরে কেটে, তিক, ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে। ওয়ান, ব্যাক, তোমার তরে, টু ব্যাক। স্টার্ট ব্যান্ড, হালকা নোট, ওনলি কেট্‌ল ড্রাম, কুটুল কুটুল কুটুল। স্টপ। শাঁখ, পুঁওঁওঁ। স্টপ।"

এর পর একেবারে তেড়ে গান, "জনগণমন অধিনায়ক নয় হে, জয় হে।"

বিগ ড্রামের, ড্যাম্ভ ড্যাম্ভ।

অভ্যর্থনা পর্ব শেষ হয়ে গেল। শোভনা, আমাদের সুন্দরী শোভনা, রাজ্যপালকে চন্দনের টিপ পরিয়েছে। রাজ্যপাল আবার তাকে একটা পালটা

টিপ পরিয়ে দিয়েছেন। সে কী গর্বের কথা! দেখি-দেখি করে সব মেয়ে তেড়ে-তেড়ে এসে দেখছে।

প্রধানশিক্ষকমশাই একটা সিল্কের উত্তরীয় রাজ্যপালকে পরিয়ে দিলেন। দু'জনের করমর্দন হল।

সহপ্রধান এইবারে মাইক্রোফোনে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানের পর্ব ঘোষণা করলেন। স্কুলের সেক্রেটারি বিখ্যাত ব্যবসায়ী, চাঁদপাল সরকার স্বল্প কথায় স্কুলের পরিচিতি দিলেন, "দিস ইজ অ্যান ওল্ড ইনস্টিটিউশন বাট স্টিল ইয়াং। এই স্কুল থেকে যাঁরা পাস করে বেরিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ আজ বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, মন্ত্রী। একমাত্র আমিই এক মূর্খ, কিস্যু, কিস্যু, হতে পা...।"

হাউহাউ কান্না। সহপ্রধান সরিয়ে আনলেন। উমাদি রেডিই ছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে ধরে দিলেন গান, "ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।"

চাঁদপালবাবুর সমস্যা তখনও মেটেনি। তিনি আমাদের সাজঘরের একটা টুলে বসে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে সমানে কাঁদছেন আর হাপুস-হাপুস করে শ্বাস ফেলছেন হাপরের মতো। ক্রমশই যেন নেতিয়ে পড়ছেন। আমরা স্যারকে ডেকে আনলুম, "দেখুন, সেই থেকে কেমন করছেন হাপরের মতো। মনে হচ্ছে, দম আটকে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে।"

পণ্ডিতমশাই কবিরাজি করেন। নাড়ি টিপে বললেন, "ভয়ঙ্কর এলোমেলো, হনুমানের নাড়ির মতো। দুর্বলে সবলা নাড়ি সা নাড়ি প্রাণঘাতিকা। এঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করাই বিধেয়।"

শুরু হল দৌড়ঝাঁপ। হেডমাস্টারমশাই মঞ্চ ছেড়ে এলেন, সহপ্রধান ছিটকে চলে এসেছেন। রাজ্যপালের ভাষণ হচ্ছে, "এডুকেশান মেক্স এ ম্যান। শিক্ষা ছাড়া মানুষ তার জীবনের অর্থ বুঝতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে সহ্যশক্তি দেয়, উদারতা দেয়। শিক্ষিতের সমাজের চেহারা শান্ত, কল্যাণমূলক, আনন্দের, অগ্রগতির, ভ্রাতৃত্বের, ভালোবাসার। অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে বনের পশুর তফাত নেই কোনও। গোরু শান্ত প্রাণী, হনুমান ছটফটে, বাঘ হিংস্র, হরিণ অহিংস, সব একজায়গায় আছে তাই এত অশান্তি। এদের যদি এডুকেশান দেওয়া যেত, হিংসা নয়, শান্তি, বৈরিতা নয়, ভ্রাতৃত্ব, যদি মিনিমাম

একটা এডুকেশানে ফেলা যেত, জঙ্গল হত সিট অব ডিপ কালচার।"

চাঁদপালবাবু চিত হয়ে শুয়ে ধড়ফড় করছেন। হেডমাস্টারমশাই বলছেন, "এ শিওর হার্ট অ্যাটাকের দিকে যাচ্ছে। এই বয়সে রোজ রাতে গাওয়া ঘিয়ের লুচি সহ্য হয়! হার্টে ফ্যাট ঢুকেছে। হয়ে গেল! সেক্রেটারি মারা গেলে ফাংশান আর হয় কী করে? পতাকা অর্ধনমিত। ব্যায়লা বাজিয়ে ড্রপ সিন। কোনওরকমে আজকের মতো প্রাণটা ধরে রাখতে পারেন না! অন্তত রাত বারোটা পর্যন্ত।"

চাঁদপালবাবু ডুকরে উঠলেন, "এ হার্ট নয়, এ হল গভর্নার শক। হল না, কিছু হল না আমার জীবনে।"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "আপনার হতে আর বাকিটা কী আছে! এই শহরে তিনখানা বাড়ি। মধ্যমগ্রামে বাগানবাড়ি। নির্বাচনে একবার দাঁড়িয়েছিলেন, পনের হাজার ভোট পেয়েছিলেন। আবার কী! আর কী হতে পারে?"

"আমি দান করব, এই মুহূর্তে আমি সায়েন্স ল্যাবরেটরির জন্যে স্কুলকে দশ লাখ দান করব।"

"আগেও বহুবার বলেছেন, ফল্‌স।"

"এবার সত্য। আমার ভেতর থেকে হৃৎপিঞ্জর ভেদ করে সেই দান বেরিয়ে আসতে চাইছে। আপনি গভর্নরকে দিয়ে অ্যানাউন্স করান।"

"আগে চেক।"

"আগে অ্যানাউন্সমেন্ট।"

"আগে চেক।"

"বই বাড়িতে।"

"নিয়ে আসুন। পাশেই বাড়ি।"

"পাঁচ লাখ দেব।"

"তাই দিন।"

"এক লাখ।"

"বেশ তাই।"

"ভেবে দেখলুম হঠকারিতা ভালো নয়, পরে ভেবেচিন্তে করা

যাবে।"

"তা হলে এখন আপনি বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। খুব উত্তেজনা হয়েছে তো।"

"আমি যদি এখানে একটু শুয়ে থাকি তা হলে আপনাদের কোনও অসুবিধে আছে কী? রাজ্যপালের সঙ্গে আমার প্রাইভেট কথা আছে। আমি রাজ্যপালের ফান্ডে দু'লাখ টাকা দান করে পদ্মশ্রী হব।"

"তা সে আপনার প্রাইভেট ব্যাপার, প্রাইভেটলি বুঝে নিন।"

"বক্তৃতা শেষ হওয়ামাত্রই অ্যানাউন্স করে দিন, মাননীয় চাঁদপাল সরকার, সেক্রেটারী, প্রখ্যাত সমাজসেবী, দানবীর, মহাবীর রাজ্যপালের ফান্ডে দু'লক্ষ টাকা দান করছেন, শিক্ষার প্রসারে। আর্তের সেবায়। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ টাকা তিনি কাল রাজ্যপালের দপ্তরে জমা করে দিয়ে আসবেন।"

সহপ্রধান বললেন, "আপনার অনেক ঢং আমরা দেখে-দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি মশাই। পরের কাঁধে বন্দুক রেখে অনেক দেগেছেন, আর না। ওই দেখুন আপনার স্ত্রী এসে গেছেন, এইবার নিজেরা বোঝাপড়া করুন। দু'লাখ টাকা দেবেন কি দেবেন না! আপনার স্ত্রীর অনুমতি আছে কি না!"

সেই মহিলা রণরঙ্গিনী। মহিলা সমিতির নেত্রী। এগিয়ে এসে হাত ধরে হ্যাঁচকা টান, "ওঠো। আর সাতদিন দেখব তারপর হাতে-পায়ে বেড়ি দিয়ে ফেলে রাখব। মাথাটা কতটা বিগড়েছে তখন বুঝবে।"

ভদ্রলোক কেঁচো হয়ে গেলেন। বলা নেই কওয়া নেই বেসুরো গাইতে লাগলেন, "জীবন আমার বিফলে গেল, লাগিল না কোনও কাজে।"

চাঁদপালবাবুর স্ত্রী, পাড়ার সবাই যাঁকে বউদি বলেন, তিনি এইবার আসল কথাটি বলে দিলেন, "এইরকম কেন করছেন জানেন? চিটফান্ড। আজ হোক কাল হোক শ্রীঘরে এঁকে যেতেই হবে। কত লোকের টাকা মেরে বসে আছেন। আর তা না হলে গণধোলাই। হাড় একদিকে, মাস একদিকে।"

সহপ্রধান বললেন, "ও, সেই কারণে রাজ্যপালের তহবিলে দান!"

চাঁদপালবাবু "ঘরের শত্রু, ঘরের শত্রু" বললে-বলতে উঠে পড়লেন। চটি গলিয়ে হাওয়া।

রাজ্যপালের ভাষণ শেষ। সহপ্রধান দৌড়ে গেলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। "আমাদের বিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হয়ে রইল আজকের দিনটি।"

রাজ্যপালের ভাষণ কিছুই শোনেননি, তবু বললেন, "সমাজ, জীবন, শিক্ষা, চরিত্রগঠন ও কর্তব্য সম্পর্কে আপনি যা বললেন, তা আমাদের মনে রাখতে হবে। দেশের বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। অখণ্ড ভারত। অখণ্ড মানব ঐক্য। বর্ণমালার নতুন পাঠ হবে এইরকম, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে নয়, অ-এ অখণ্ড ভারত। আ-এ আম নয়, আত্মত্যাগ। ই-তে ইঁদুর নয়, ইনকিলাব। ঈ-তে ঈগল নয়, ঈষা, ঈষা মানে লাঙ্গলদণ্ড। প্লাউ। মানে কর্ষণ, মানে মানবজমিনকে চাষ করতে হবে। এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।"

ফাটাফাটি হাততালি। রাজ্যপাল বোঝেন না, কিন্তু হাততালির অর্থ বোঝেন তো! সহপ্রধান তাঁর চেয়ে বেশি হাততালি পেয়েছেন। আমাদের গর্ব। জিন্দাবাদ। বন্দেমাতরম।

এইবার আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুভব্রতর গলা খুব ভারী। মাস্টারমশাইরা বলেন, ব্যস ভয়েস। শুভব্রত নিজে বলে, আমার গোল্ডেন ভয়েস। তার জীবনের একমাত্র অ্যাম্বিশান হল, টেলিভিশানে খবর পড়বে। সেই শুভব্রত ঘোষণা করছে। "এখন শুরু হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমে তিনটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করছে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। তারপরেই আমাদের নাটক, রাবণবধ। রচনা, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়, নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়, অভিনয়াংশে.....।" হড়হড় করে নাম পড়ে গেল। সবশেষে হনুমানের দল। সে আবার কত কায়দা, হনুমানশ্রী পঞ্চানন পাল, নির্মল দুবে, সনাতন সরকার, শ্যামল সর্বাধিকারী....।

সামনের ফালিমঞ্চে গান বসে গেল। তারস্বরে। পেছনে পরদা, তার পেছনে আমরা। শিবাঞ্জন নেতা। গাছের কাট আউট বাঁ পাশে। তার তলায় বেদি। বাল্মীকি বসবেন। কাটআউটটা হয়েছে ভালো। তবে একটু নড়বড়ে। একটু দূরেই টিভির বাক্স। সীতা ঘাপটি মেরে থাকবে। তুলো দিয়ে ক্রৌঞ্চ তৈরি হয়েছে। প্যাকাটির তির মারাই আছে। স্টেজের মাথায় কালো সুতো দিয়ে ঝোলানো। ঠিক সময়ে ধপাস করে পড়বে। পরদা ওঠামাত্রই

দেখা যাবে, বাঁ দিকে বাল্মীকি। পেছনে হরেনবাবুর আঁকা সিন। বনের দৃশ্য। একটা নদী থাকলে ভালো হত। তমসা নদী। যাক, সেটা নেই। মাঝখানে ইঁদুরে খাওয়া একটা গর্ত। শিবাঞ্জন বলেছে ভালোই হয়েছে। ওই ফুটো দিয়ে লাইট মারবে। সূর্যের কিরণ।

ওদিকে একটা ঘরে মেকআপ চলেছে। রাম আর সীতাকে নিয়ে তেমন সমস্যা হল না। সীতার ঠোঁটের উপর সামান্য গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছিল। সকালে সেলুনে গিয়ে একটা পোঁচ মেরে এসেছে। জীবনের প্রথম দাড়ি কামানো। স্যার খুব সহজেই বাল্মীকি হলে বটে। সমস্যা একটাই হল, নকল দাড়ি, গোঁফ, চুলের জন্য মাঝে-মাঝে হাঁচি। সহপ্রধান বললেন, "মরেচে, এঁর তো উইগ অ্যালার্জি রে ভাই! তমসার তিরে বসে বাল্মীকি যদি ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে হাঁচেন তা হলেই তো হয়ে গেল! শিগগির অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট এনে খাওয়া।" ননী দৌড়ল দোকানে।

বাংলারস্যার বললেন, "দাড়িটা তেমন প্রবলেম করছে না। ট্রাব্‌লসাম হল গোঁফটা।"

সহপ্রধান বললেন, "সময় থাকতে-থাকতেই হনুমানদের রেডি করে ফ্যালো। লেজ ফিট করে দাও, লেজ ফিট করে দাও।"

সার-সার হনুমান লাল কাপড় মালকোঁচা মেরে পরে দাঁড়িয়ে আছে। শিবাঞ্জন বাঁকা-বাঁকা, খাড়া-খাড়া, সোঁটা-সোঁটা লেজ ফিট করছে। এক-একজনের লেজ লাগানো যেই হয়ে যাচ্ছে সহপ্রধান বলছেন, "লাফাও লাফাও। জাম্প, জাম্প।" এর আবার একটা গান তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন কে জানে, "রথে চড়িকিড়ি যাঁউছি।"

মহা সমস্যা দেখা দিল রাবণের মাথা নিয়ে। একসারিতে দশটা পেপার প্লেটের মুণ্ডু। ভাবা গিয়েছিল, কানের তলা দিয়ে স্ট্র্যাপ ঘুরিয়ে বেঁধে দিলেই হয়ে যাবে। হিসেব মিলছে না।

শিবাঞ্জন বলছে, "স্যার এদিকে পাঁচ ওদিকে পাঁচ হচ্ছে না তো!"

"কেন হচ্ছে না! বাঁ দিকে পাঁচ, ডান দিকে পাঁচ, সোজা হিসেব।"

"হিসেব তো সোজা হবে ভেবেছিলুম। হচ্ছে না যে, মাঝখানে ওর ওরিজিন্যাল মুণ্ডুটাই তো প্রবলেম করেছে।"

"ওটাকে ফেলে দে না।"

"আসল মুণ্ডুটা ফেলব কী করে! ওটা তো জন্মের সময় থেকেই ওইখানে সেন্টারে ফিক্সড হয়ে আছে। ও তো সরানো যাবে না।"

"তা হলে এক কাজ কর, ওটা যেমন আছে থাক। এপাশে পাঁচটা ওপাশে পাঁচটা ফিট করে দে।"

"তা হলে তো রাবণের এগারোটা মুণ্ডু হয়ে যাবে সার।"

"রাবণের মুণ্ডু ক'টা ছিল, শাস্ত্র কী বলছে! পণ্ডিতমশাইকে ডাক।"

"দশটা মাথা ছিল স্যার, দশানন।"

"তা হলে কী রাবণের কোনও মাথাই সেন্টারে ছিল না! একটা ছবি দ্যাখ না।"

"রাবণের ছবি কোথায় পাব স্যার!"

"কেন, ক্যালেন্ডার!"

"রাবণের ক্যালেন্ডার হয় না স্যার। রামচন্দ্রের হয়।"

"ডাক, ডেকে নিয়ে আর অঙ্কেরস্যারকে। এসব হিসেবের ব্যাপার।"

অঙ্কেরস্যার এলেন, "কী সমস্যা!"

"খুব জটিল অঙ্ক। এই হল রাবণ। এই দেখুন সেন্টারে ওর জন্মগত মাথা। এইবার দেখুন ওইখানে দশটা নকল মাথা। সেন্টার থেকে আসল মাথা সরানো যাবে না। কিন্তু ওর দশটা মাথা করতে হবে। হিসেবটা কী হবে!"

"কেন? আসল মাথাটা রেখে ন'টা মাথা ফিট করে দিন।"

"তা হলে তো সমান হচ্ছে না। ধরুন এপাশে চারটে ওপাশে চারটে করলে, ন'টা হচ্ছে। দশটা হচ্ছে না। একপাশে পাঁচটা, আর-একপাশে চারটে হয়ে যাচ্ছে। একপাশে একটা মাথা বেরিয়ে থাকছে।"

অঙ্কেরস্যার একটু ভেবে বললেন, "রাবণ দেখছি সারাটা জীবন জ্বালাবে। এপাশে চারটে ওপাশে চারটে ওই ন'টা মাথাই থাক না, কে আর গুনে দেখছে!"

শিবাঞ্জন বলল, "স্যার, একটা মাথা আমি রাবণের বুকে আটকে দিই।"

"আইডিয়া!" সহপ্রধান তুড়ি লাফ মারলেন, "এই ছেলেটা আইনস্টাইন হবে রে। হোয়াট এ মাথা! রাবণের দশটা মাথা এই একটা মাথার কাছে নাথিং।"

গান শেষ। দশ মিনিটের বিরতি। দর্শকদের আসনে লোক আর ধরে না। বাচ্চাদের ক্যাঁচম্যাঁচ। অঙ্কেরস্যার একটা বেত হাতে, "অ্যায়, অ্যায়," করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। মায়েরা এসেছেন ছেলেদের অভিনয় দেখতে। স্কুলের বাইরে গেটের দু'ধারে লম্ফ জ্বালানো ঘুগনি, আর কুপি জ্বালানো ফুচকা এসে গেছে। ঠ্যাং করে ঘণ্টা বাজল।

ঘিসঘিস করে পরদা সরে গেল দু'পাশে। শেষের দিকটায় আটকে গিয়েছিল। কে হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে দিলে। তমালের তলায় বাল্মীকি। টেপে পাখির ডাক। পেছনের সিনের ফুটো দিয়ে নীল একটা আলো আসছে, যেন ভোর হচ্ছে। বাল্মীকি বসে আছেন আলো-আঁধারে। টিভির বাক্সে সীতা ঘাপটি মেরে আছে।

এই পর্যন্ত বেশ ছিল। হঠাৎ বাল্মীকি ভ্যাঁ-ভ্যাঁচ করে একবার হাঁচলেন। স্যারের হাঁচি কখনও আস্তে হয় না। যেন বোমা ফাটল। এইবার হল কী, একটাতে খতম হল না। পরপর, সিরিজ। অন্তত গোটা দশ-বারো। সঙ্গে দর্শকদের চিৎকার, "বাল্মীকির ফ্লু হয়েছে, বাল্মীকির ফ্লু।"

অঙ্কেরস্যার দাবড়ানি দিলেন, "মেরে সবক'টাকে বাইরে বের করে দেব।"

সহপ্রধান উইংসের পাশেই ছিলেন। প্রম্পটার। তিনি বললেন, "নির্মলটা ডোবালে। আমাদের আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল, তমসায় চান করে বাল্মীকির সর্দি হয়েছে। সিনটা নষ্ট হওয়ার আগেই পরেশ তুই, ক্রৌঞ্চের দড়িটা কেটে দে।"

পরেশ রেডিই ছিল। মারলে কাঁচি। এমনই বরাত, ক্রৌঞ্চ স্টেজের সামনে না পড়ে, পড়ল গিয়ে সীতার বাক্সে। সীতা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্যাকাটির আচমকা খোঁচায়, "উরে বাব্বা রে" বলে চিৎকার করে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেরা চিৎকার করে উঠল, "কে আছিস ভেতরে বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়।"

সীতা সটান উঠে দাঁড়াল। দু'হাতে ধরে আছে ন্যাকড়া আর তুলো দিয়ে তৈরি সেই বক। বকটাকে ফেলে দিলেই পারত, তা না করে, ক্যাবলার মতো জিজ্ঞেস করল, "এটাকে কী করব স্যার!"

বাল্মীকি ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, "আমার শ্রাদ্ধ করবি গাধা।"

সীতা বলল, "আমি কী আবার শুয়ে পড়ব স্যার!"

সহপ্রধান চিৎকার করলেন, "ড্রপ সিন, ড্রপ সিন।"

যার উপর পরদা টানার দায়িত্ব ছিল, সে কেমন করে জানবে সিন এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে! এদিকে বাল্মীকির আবার ফ্যাঁচাত-ফ্যাঁচাত শুরু হয়েছে। এর ওপর আর-এক কাণ্ড। শিবাঞ্জনের প্লাইউড কাটা তমালবৃক্ষ বাল্মীকির ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে শুয়ে পড়ল।

সবাই চিৎকার করে উঠলেন, "সমূলে উৎপাটিত, সমূলে উৎপাটিত। স্যারকে বাঁচা, স্যারকে বাঁচা।"

নির্মলস্যার মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন, তার উপর শিবাঞ্জনের কেরামতি।

হড়হড় করে পরদা নেমে এল। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের যবনিকা।

সহপ্রধান দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "আর কী হবে! এই নাটক এইখানেই শেষ। রামায়ণ আর লিখবে কে, বাল্মীকিই তো হাসপাতালে চলে গেল।"

প্রধানশিক্ষক বললেন, "ঘাবড়াবার কিছু নেই, এই বাল্মীকি কাত হলেও, আসল বাল্মীকি অনেক আগেই রামায়ণ লিখে রেখে গেছেন, এটা তো শেষ থেকে শুরু হচ্ছিল, এইবার শুরু থেকে শেষ হবে।"

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যে আবার শুরু হল নাটক। বাংলারস্যার এরই মধ্যে ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে নিজের একটা ছবি তুলিয়ে নিলেন। তারপর দাড়ি, গোঁফ, চুল সব খুলে ফেলে গুম মেরে বসে রইলেন একপাশে।

হেডমাস্টারমশাই বলতে গেলেন, "একটু কেটেফুটে গেছে, ওষুধ লাগাবেন?"

গম্ভীর গলায় বললেন, "ত্রেতাযুগে কোনও মেডিসিন ছিল না।"

"কিন্তু এটা তো কলি, পিঠে পেরেক ফুটে গেছে, টিটেনাস হলে

কে দেখবে!"

"আমি এখন রামায়ণের যুগে আছি। সীতাটাকে আমি পরে পেটাব, কলিতে আগে ফিরে আসি।" আবার শুরু হল নাটক। বেশ ভালোই এগোচ্ছে। প্রম্পট শুনতে না পেয়ে রাম একবার বলে ফেলেছিল, "কী বললেন স্যার?"

সহপ্রধান বললেন, "বলো, পিতা আপনার আদেশ শিরোধার্য।"

রাম বলল, "বলো, পিতা আপনার আদেশ শিরোধার্য।"

সহপ্রধান বললেন, "গাধা।"

রাম বললেন, "গাধা।"

এক্সপার্ট দশরথ, কায়দা কররে জায়গাটা মেরামত করে দিলে, "বাবা, তুমি রাজার ছেলে, গাধা কেন, ঘোড়ায় চেপে যাবে, সাদা ঘোড়া।"

রাম সপরিবার বনবাসে গেল। দেখতে-দেখতে এসে গেল সীতাহরণের দৃশ্য। রাবণ এসেছে। রাবণের এখন একটা মাথা। সন্নাসীর বেশ। রাবণ বলছে, "ভগবতি! ভিক্ষাং দেহি!"

সীতা ভিক্ষা দেবে। গণ্ডির বাইরে আসবে না। তানা-নানা করছে সীতা। নাটকে সেইরকমই ছিল। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, রাবণ সীতার হাত ধরে বারল এক হ্যাঁচকা টান। সীতা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এইবার রাবণ সীতার চুল ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে উইংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রাবণ এই সুযোগটাই খুঁজছিল। সীতার সঙ্গে অনেকদিনের, অনেক ব্যাপারের ফয়সালা। পাছে পরচুল খুলে যায়, সীতা বোকার মতো দু'হাতে চুল চেপে ধরে আছে। হিন্দি ছবিতে ভিলেনকে যেমন গাড়ি বা ঘোড়ার পেছনে বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে যায়, রাবণ সীতাকে সেইভাবে নিয়ে যাচ্ছে। পাশেই পুষ্পকরথ। সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

উইংস দিয়ে স্টেজের পেছনে আসামাত্রই প্রধানশিক্ষক একেবারে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। রাবণের রাবণামি তিনি বরদাস্ত করবেন না। রাবণের রাবণত্ব তিনি শেষ করবেন। মার মার, "হতভাগা! এই তোর সীতাহরণ!" রাবণের পরচুল ছিঁড়েখুঁড়ে চারপাশে ছত্রাকার। দাড়ি উপড়ে পড়ে আছে একপাশে, রাবণ আর রাবণ রইল না। প্রসূন হয়ে গেল।

হঠাৎ রাম ছুটে এল, "এ কী করছেন স্যার! রাবণকে তো আমি

বধ করব। তার আগে আপনিই যে বধ করে দিলেন!"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "নিজের বউকে সামলাতে পারিস না, তুই করবি রাবণবধ!"

লেজখাড়া হনুমানরা বলল, "আমরা হাত লাগাব স্যার!"

"কোনও প্রয়োজন নেই, আমি একাই তুলোধুনে দিচ্ছি।"

সহপ্রধান মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমাদের নাটক এইখানেই শেষ। আপনাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই, স্টেজের পেছনে খুব সহজেই প্রধানশিক্ষকমশাই রাবণবধ করে দিয়েছেন। সীতাকে আমরা টিংচার আইডিন মাখিয়ে ফেলে রেখেছি, বাল্মীকি মনের দুঃখে বাড়ি চলে গেছেন। তাঁর প্রেশার এই মুহূর্তে একশো আশি, নব্বই। নমস্কার!"

ভটাভট হাততালি। হে-হে চিৎকার। আমাদের অনুষ্ঠান খতম।

হেডস্যার

আজ শনিবার। হেডস্যার আজ ছুটির পর মিটিং ডেকেছেন। মিটিং-এর পর ইটিং এর ব্যবস্থা আছে। ক্লাস নাইন আর টেনের ছেলেরাই শুধু থাকবে। আমাদের স্কুলের বিশিষ্ট দারোয়ান রামাধর দা তাঁর ছোট্ট ঘরে ডাব্বা, ডাব্বা ঝালমুড়ি তৈরি করছেন। গুঁড়ো মশলার গন্ধে জিভে জল আসছে।

হেডস্যার এলেন। আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালুম। মধ্যবয়সি মানুষ। বেশ মোটাসোটা। ফর্সা চেহারা। সাদা পাঞ্জাবি। বোধহয় খদ্দর। মোটা ধুতি। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। কদমছাঁট চুল। আমাদের প্রায়ই বলেন — এদেশে একজন মানুষই জন্মেছিলেন, তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমরা তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমরা সব স্বার্থপর শয়তানের দল। আমাদের ধরে ধরে পেটান উচিত। আমরা দেশের কলঙ্ক। রবীন্দ্রনাথ লাখ কথার এক কথা বলে গেছেন, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।

চেয়ারে বসতে বসতে, স্যার বললেন, — বোসো, বোসো, আর সুব্রতটাকে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসো।

— সে কোথায় আছে স্যার?

— পেটুকরা যেখানে থাকে। রামাধরের ঘরের সামনে ছোঁক ছোঁক করছে। আমাদের যেতে হল না। সুব্রতই এল হুসহাস করতে করতে।

হেডস্যার জিজ্ঞেস করলেন, — আপনি কোথায় ছিলেন জানতে পারি! সুব্রতর চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো হয়ে আছে। মুখে হুসহাস শব্দ। সুব্রত খুব সহজ, সরল। একটু বোকা বোকা। বাঁকা কথা বোঝে না। কেরিয়ার-ফেরিয়ারের ধার ধারে না। নিজের জীবনের মজার মজার ঘটনা বলে সারাক্ষণ আমাদের মাতিয়ে রাখে। স্যাররাও তাকে খুব ভালোবাসেন।

সুব্রত বললে, — অ্যায়সা ঝাল ছেড়েছে কেউ খেতে পারবে না। জিভের তলায় বাটি ধরতে হবে। আপনার স্যার আলসার আছে, তাই একটু

টেস্ট করতে গিয়েছিলুম। ঝাল কমাও, ঝাল কমাও, মুড়ি ঢালো। আমার হেডস্যার মুখে দিতে পারবেন না। এ সেই সরস্বতী পুজোর আলুর দম-কেস। আমাদের কথা শুনলেন না। খেয়ে অসুস্থ হলেন।

স্যার সুব্রতর মন জানেন। অবিশ্বাস করলেন না। বললেন, — সামনে বোস, আমার চোখের সামনে। একটা কথা জেনে রাখ এখন সব বাঙালিদের পেটেই আলসার।

আমরা সবাই কোরাসে বললুম। — ইয়েস স্যার।

হেডস্যার সভার কাজ শুরু করলেন। ছোট্ট একটি বক্তৃতা — বয়েজ! যেভাবেই হোক আমাদের পরোপকার করতে হবে। নিঃস্বার্থ সেবা। ঘোর দুর্দিন আমাদের সামনে। ছেলেরা বাপ-মাকে দেখে না। ভাই ভাইকে দেখে না। নেতারা দেশ দেখে না। ফি না দিলে ডাক্তার রোগী দেখে না। মাতালে দেশ ভরে গেছে। চতুর্দিকে সন্ত্রাসবাদী। এই অবস্থায় আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হবে পরোপকার। পরের উপকার। তোমরা সব গ্রুপ করে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়। সমাজের সর্বস্তরে ঢুকে যাও। আমাদের আদর্শ হবে উইপোকা। উইপোকা যেমন বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে, খাঁজে খাঁজে ঢুকে যায়, আমাদেরও সেই ভাবে ভাঁজে ভাঁজে, সমাজের খাঁজে খাঁজে ঢুকে যেতে হবে। উইপোকা ধ্বংস করে আমরা গঠন করব। আমরা চটাপট, চটাপট হাততালি দিয়ে উঠলুম। খুব ভালো লেগেছে আমাদের।

হেডস্যার খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, — এটা কি নাট্যশালা! পায়রা ওড়াচ্ছিস! ঠিক এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন আমাদের বাংলারস্যার নিমাইবাবু। প্রায় ছফুট লম্বা। স্বাস্থ্যবান। এমন চেহারায় কেন যে বাংলায় পড়ে আছেন আমরা বুঝতে পারি না। আবার কবিতা লেখেন। সেইসব কবিতা আমাদের ক্লাসে শোনান। মানে বুঝি না, তবে শব্দের খেলা, বেশ ভালো লাগে। মেঘলা দিনে সাংঘাতিক কবিতা আসে। কাল সেইরকম একটা দিন ছিল। ক্লাসে বসে বসেই স্যার লিখে ফেললেন,

মেঘের ফানুষ উড়ছে
মানুষ কি আর দেখছে।
কাজের কথাই বলছে
ময়ূর কেবল নাচছে।

আমরা টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে উঠলুম, — ফাটাফাটি, ফাটাফাটি। স্যার বললেন, — আলুকাবলি, আলুকাবলি। তার মানে আমাদের আলুকাবলি খাওয়াবেন। তৈরি করবে রামাধর। আমাদের রামাধরের কোনো তুলনা নেই। রোজ ভোরবেলা গঙ্গায় চান করে। মহাবীরের পুজো করে। আগে কুস্তি করত, এখন আর করে না। যোগাসন করে। স্যার বললেন, — আলুকাবলি নিয়ে কবিতা হবে, এক একজন এক একটা লাইন লিখবে। চলে এস বোর্ডে।

আমাদের মধ্যে স্বরাজ কবিতা লেখে। বোর্ডে গিয়ে লিখে এল, ফাটাফাটি আলুকাবলি।

মধুকর পরের লাইন লিখলে, সুদ চায়না এই কাবলি।

সব লেখালিখির পর কবিতাটা যা দাঁড়াল

ফাটাফাটি আলুকাবলি,
সুদ চায় না এই কাবলি,
জিভে জল, টক, ঝাল আর মিষ্টি,
কাবুল ফেলে বাঙলায় এল এই কাবলি।

নিমাই স্যার হেডস্যারের পাশের চেয়ারে বসে বললেন — পরোপকার খুব কঠিন কাজ। আমাদের এই জায়গাটা এত হতচ্ছাড়া না, হয় বিধ্বংসী বন্যা, না হয় দুর্ভিক্ষ। এই দুটো হলে পরোপকারের কাজটা সহজ হয়। হাণ্ডা হাণ্ডা খিঁচুড়ি বানাও, ঝপাঝপ দিয়ে যাও, কপাকপ খেয়ে যাও। হেডস্যার বললেন, — সকলের ভাগ্য কি আর ভালো হয় নিমাইবাবু। আমাদের গভীরে ঢুকে কাজ করতে হবে। বেগুন গাছে ঝোলে। মারো টান। হাতে এসে গেল, আর আলু! মাটি খুঁড়ে তুলতে হয়। কারো বেগুনে বরাত কারো আলুর বরাত। আমাদের খুঁড়তে হবে। প্রথমে সারভে।

সুব্রত বললে, — স্যার! আমার একটা প্রশ্ন আছে।

— একটা কেন, তুমি হাজারটা প্রশ্ন কর।

— স্যার! পরোপকার জিনিসটা ঠিক কী?

— জিনিস বলছিস কী রে গাধা। বল কর্ম। পরের উপকার?

— উপকার কাকে বলে স্যার?

অপকারের উলটটাই হল উপকার। যেমন মানুষের উলট হল অমানুষ। উদাহরণ শোন — একটা মানুষকে ঠেলে ফেলে দিলি। এটা হল অপকার। হাত ধরে টেনে তুললি এটা উপকার। একজন মানুষ খেতে পায় না, তাকে খাওয়ালি এটা উপকার।

নিমাই স্যার বললেন, — এটা উপকার নয় সেবা।

— আপনি আবার নতুন কথা এনে গুলিয়ে দেবেন না।

ব্যাপার নয়, বলুন বিষয়।

— ব্যাপার আর বিষয় এক। এটা শিক্ষার ক্লাস নয়। উপকার হল সাহায্য যাতে সমস্যার সমাধান হয়। তোমরা ঘুরবে, ঘুরে দেখবে। নোট নেবে। প্রথমেই কিছু করবে না। আমাদের জায়গায় অর্থাৎ কমিটিতে এসে জানাবে। তারপর অ্যাকসান।

ঝালমুড়ি এসে গেল। রামাধর বানায়। দরজা দিয়ে ঢুকছে। ঘরটা গন্ধে ভরে গেল। মার কাট কাট। ঠোঙায় ঠোঙায় ভাগ ভাগ এনেছে। সুব্রত টপাটপ সব দিয়ে দিল। একটা বেশি হয়েছে।

হেডস্যার বললেন, — ওটা রামাধরের।

সুব্রত বললে, — আমি স্যার বাইরে গিয়ে খাব?

— কেন?

— গাছতলায় বসে খেতে ভালো লাগে।

নিমাই স্যার বললেন, — ঠিক বলেছিস। আমিও যাই।

।। দুই।।

একটু দূরে বারুই পাড়া। ওই পাড়ায় বড়ো বড়ো কারিগরদের বাস। তাঁরা সেতার, সরোদ, তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা, এইসব তৈরি করেন। বড়ো ছোটো অনেক দোকান আছে। আমরা ওই দিকটায় যাই লোভে লোভে। একটা বড়ো কুল বাগান আছে।

আমি আর সঞ্জয় গেছি। বিকেল বেলা। সরস্বতী পুজো আসছে। গাছে গাছে কেমন কুল ধরেছে দেখতে হবে তো। হঠাৎ দেখি একটা দোকানের সামনে এক বৃদ্ধ মইয়ের উপর কোনো রকমে দাঁড়িয়ে বেশ বড়ো একটা

সাইনবোর্ড লাগাতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না। বয়েস হয়েছে। দুর্বল শরীর।

সঞ্জয় বললে, — এই দেখেছিস?

— কী দেখব?

— পরোপকার।

— কে করছে?

— কেউ করেনি। আমরা করতে পারি। ওই দেখ, দাদু সাইনবোর্ড ঝোলাচ্ছে। একা। পারছে না। যে কোনো মুহূর্তে মই নিয়ে পড়ে যেতে পারেন। চল সাহায্য করি।

সঞ্জয় বললে, — অতবড়ো জিনিসটা একা পারবেন?

— আর একজন পাচ্ছি কোথায়?

— আপনার ছেলে নেই?

— ছিল। বিয়ে করে বউ নিয়ে পালিয়েছে। ছেলেরা যা করে থাকে?

— কই আমার দাদা তো তা করেনি!

— তোমার দাদা একটি গাধা।

সঞ্জয় আমাকে বললে, — দেখছিস, দাদাকে গাধা বলছে।

— এ গাধা ভালো গাধা। তোর দাদার প্রশংসা।

সঞ্জয় বৃদ্ধকে বললেন, — আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

বৃদ্ধ বললেন, — মতলব?

সঞ্জয় বললে, — আমরা পরোপকার করে থাকি।

আমি মরলে এসো। কাঁধ দিও। বাঙালি তো আবার একটা পরোপকারই জানে, বলো হরি হরিবোল।

কথা শেষ করেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মই, সাইনবোর্ড সবশুদ্ধ নিয়ে দাম করে পড়ে গেলেন। সাইনবোর্ডের তলায় বৃদ্ধ। চিৎকার করছেন হিন্দিতে— জানে মারা, জানে মারা। চারপাশ থেকে কয়েকজন ছুটে আসছে।

আমি আর সঞ্জয় ছুটছি। পেছনে চিৎকার— পালাচ্ছে, পালাচ্ছে। পাকাড়ো, পাকাড়ো।

আমরা কুলবাগানের মধ্যে দিয়ে, পুকুরপাড় ধরে কোনোরকমে

পালিয়ে এলুম। কুলকাঁটায় শরীর ক্ষত-বিক্ষত। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছি। হেডস্যার অনেক রাত পর্যন্ত স্কুলের অফিসে কাজ করেন।

আমাদের দেখে বললেন, — কী ব্যাপার? এ কী চেহারা!

সব শুনে বললেন, — আমি তোদের কী বলেছিলুম, আগে এসে রিপোর্ট করবি। কমিটি মিটিং-এ পাস হবে, তারপর অ্যাকসান। তোরা যেটা করতে গিয়েছিলিস, সেটা পরোপকার নয়। সাহায্য। কালই আমি মিটিং ডাকছি!

সঞ্জয় বললে, — ঝালমুড়ি হবে স্যার?

— না, আলুকাবলি হবে।

সঞ্জয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, ইয়া হু!

হেডস্যার ভুরু কুঁচকে বললেন, — এটা কী হল?

— এটা স্যার আনন্দের চিৎকার।

।। তিন।।

সেই নিউহলে মিটিং। বাংলারস্যার আর আমাদের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটারও এসেছেন। আমাদের ব্যায়াম, আসন করান বটে, নিজের অম্বলের অসুখ। দশ মিনিটের মধ্যে তিনবার ঢেঁকুর তুললেন ভেউ ভেউ করে। হেডস্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, জোয়ানে আরক খেয়েছিলেন?

করুণ মুখে বললেন, ইলিশ মাছ!

এদিক নেই ওদিক আছে। যার জল সহ্য হয় না ইলিশ মাছ! কটা খেয়েছেন?

— খাবো না, খাবো না করে তিন পিস মেরে দিয়েছি।

— আপনি ইলিশ মেরেছেন এইবার ইলিশ আপনাকে মারবে। গঙ্গার ধারে গিয়ে এক ডেলা মাটি খেয়ে আসুন। মিনিটে, মিনিটে এইরকম ঢেঁকুর তুললে সভা তো সাসপেন্ড করে দিতে হবে।

বাংলারস্যার বললেন, — সভা সাসপেন্ড না করে এই ব্যায়ামবীরকে সাসপেন্ড করে দিন। বাড়ি গিয়ে বারান্দায় বসে ঢেঁকুর তুলে বাড়ির লোককে মোহিত করুন।

ব্যায়ামস্যার বললেন, — আমাকে আলুকাবলিটা দিয়ে দিলে এখুনি চলে যেতে পারি।

হেডস্যার অবাক হয়ে বললেন, — এর উপর আলুকাবলি চাপাবেন?

ব্যায়ামস্যার বললেন, — হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়ে দেখেননি। পোর্টারকে ডেকেছেন, ভারি ভারি মাল মাথায় তুলেছে। দু-কাঁধে দুলছে দুটো ব্যাগ। আপনার হাতের হাতব্যাগটা দেখিয়ে বলছে, ওটাও আমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিন। এ আপনার সেই কেস। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।

আমাদের মধ্যে নিমাই খুব উসখুস করছিল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, — স্যার! আমাদের পাড়ায় একটা পরোপকার পাকছে।

হেডস্যার বললেন, — ভাষাটা একবার শুনুন। পরোপকার কী ফল, যে পাকবে?

— না স্যার পরোপকারের একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

শুনি কী রকম সুযোগ!

আমাদের বাড়ির পাশেই থাকেন পরেশ জেঠু। সকাল থেকেই খাবি খাচ্ছেন। একটু পরেই মারা যাবেন। খিটকেল টাইপের লোক। জ্যাঠাইমা কাঁদছেন আর বলছেন, — কে কাঁধ দেবে।

হেডস্যার বললেন, — আমাদের ছেলেরা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। কী সব ভাষা, খিটকেল, খিচাইন, ক্যাচাল।

ব্যায়ামস্যার বিশাল একটা ঢেঁকুর তুলে বললেন, — সব ওই টিভি।

হেডস্যার করুণ গলায় বললেন, — কথা বলছেন কেন! কথা বললেই যখন ঢেঁকুর লিক করছে।

বাংলারস্যার বললেন, — বড্ড বাজে দিকে আমাদের মন চলে যাচ্চে। পরেশবাবুকে আমি চিনি। একটা মানুষ মারা গেলে তার যেমন প্রাণ থাকে না, সেইরকম গুণাগুণও থাকে না। আমাদের প্রত্যেকের একটা সামাজিক কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্যবোধে ছেলেরা কাঁধ দেবে। একজন চলে যাও ওখানে। শেষ খাবিটা খাওয়া হয়ে গেলে খবর পাঠাও। আমাদের বিদ্যামন্দিরের টিম গিয়ে সৎকার করে আসবে।

হেডস্যার জনমত চাইলেন। কর্তব্য আর পরোপকার কি এক হল?

অবশ্যই হল। অত বড়ো একটা সমিতি তৈরি হয়ে গেল, হিন্দু সৎকার সমিতি। অসহায় মানুষ রাতবিরেতে মারা গেলে কী হবে? এত খালি প্যাকেট নয়, যে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। সেকালে কত হিতকারী সভা, সমিতি ছিল। জলে ডুবে গেলে, পাতকুয়ায় পড়ে গেলে, ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাত থেকে গিরে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে....।

হেডস্যার বললেন, — হঠাৎ হিন্দি শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? গিরে!

— আমি যে বাংলা। সাহিত্য আমার বিষয়। তিনখানা উপন্যাস শেষ। চতুর্থ প্রায় শেষ। একবার পড়ে গেল বলেছি। একই ক্রিয়া আমি পরপর দুবার ব্যবহার করি না। আমার ছাত্ররা ব্যবহার করুক তাও আমি চাই না।

হেডস্যার বললেন, — উপন্যাসগুলো যন্ত্রস্থ হবে কবে?

— সে কি এক কথায় হয় স্যার! মেয়ের বিয়ের মতো! প্রকাশকরা সব পাত্রপক্ষ। নতুন লেখকের লেখা ছাপবে কে?

— এ আবার কী? সব লেখকই তো একসময় নতুন ছিলেন। ছাপতে ছাপতে তবেই না পুরনো হলেন।

— সে কথা কে শুনছে স্যার!

— যাক, আমাদের কথায় আসি। কতকগুলো জিনিস বোঝার আছে, যেমন পরোপকার, সেবা, সাহায্য, কর্তব্য, পরহিত, কোন্‌টা কী? আমাদের থেকে শ্যামল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, — স্যার! আমার ঠাকুমা একেবারে কোমর ভাঙা। আমাকে ধরেছেন রোজ সকালে গঙ্গায় স্নান করিয়ে আনতে হবে। এটা কি পরোপকারের মধ্যে পড়ে। যদি পড়ে, তা হলে আমাকে করতে হবে। আর তাহলে সকালে আমার পড়া হবে না। আর পড়া না হলে আমি ফেল করব। আর ফেল করলে আমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। আর দূর করে দিলে আমি কোথায় যাব, কী খাব! শ্যামল বসে পড়ল।

হেডস্যার বললেন, — ঠাকুমা পর নন, আপনজন। এ তোমার পরোপকারের মধ্যে পড়ছে না। আপনি কি বলেন?

বাংলাস্যার বললেন, — শ্যামলের কেসটা সেবার মধ্যে পড়ছে।

আর স্বামীজি পরোপকার, দয়া এইসব কথা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, শিবজ্ঞানে জীব সেবা। তা হলে?

হেডস্যার বললেন, — তাহলে!

তাহলে ব্যাপারটা একটা কথায় এসে দাঁড়াল — সেবা। সেবার মধ্যেই সব আছে।

ব্রজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, — স্যার! আমার বোনের যখনই জ্বর হয় তখনই পা দুটো এগিয়ে দিয়ে বলে, পদসেবা কর।

ব্যায়ামস্যার বললেন, — করবি! সঙ্গে সঙ্গে ভেউ করে ঢেঁকুর।

নীলাঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, — স্যার! আমার মনে হয় কামারপাড়ায় একটা প্রাইমারি স্কুল করা যেতে পারে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সারাদিন মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। খুব গরিব ওরা।

হেডস্যার বললেন, — গুড আইডিয়া!

বাংলাস্যার বললেন, — আইডিয়া গুড; কিন্তু করা যাবে না। রাজনীতি।

হেডস্যার ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, — আমরা তা হলে কী করব?

— কিচ্ছু করব না, মিটিং করব।

বিষ্ণু হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এসে ঢুকল।

—কী রে! বাঘে তাড়া করেছে?

বিষ্ণু বললে, — শিগগির, শিগগির। পরোপকারের মেশিন বের করুন।

—সে আবার কী?

— বাড়িওয়ালা গুণ্ডা এনে আমাদের সব জিনিসপত্তর বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। বাবাও হাসপাতালে। মাকে মেরেছে। দিদির চশমা ভেঙে দিয়েছে।

হেডস্যার বললেন, — পুলিশ।

ব্যায়ামস্যার বললেন, — পুলিশ কী করবে? এসব পেটি কেস।

— তাহলে কে করবে?

কেউ করবে না। দেশ এখন আইনের হাতের বাইরে।

অপরেশ উঠে দাঁড়াল, — চলুন না স্যার আমরা দল বেঁধে সবাই যাই।

হেডস্যার উঠে দাঁড়ালেন, — নিশ্চয় যাব।

বাংলাস্যার সাবধান করলেন, — আপনার বুকে পেসমেকার। আর আমিতো যেতে পারবোই না গল ব্লাডার।

ব্যায়ামস্যার বললেন, — আর আমারও অম্বল! আজ এক বছর হয়ে গেল একটাও সিঙ্গাড়া খাইনি, কড়াইসুঁটির কচুরি খাইনি।

আমাদের মধ্যে অপরেশ অন্য ধাতুতে তৈরি। যেমন চেহারা সেইরকম সাহস। ত্রিভুবনে অপরেশের কেউ নেই। অনেক সময় মুটেগিরি করে পয়সা রোজগার করে। খুব ভোরে বাড়ি বাড়ি দুধ বিক্রি করে। লেখাপড়ায় ভীষণ ভালো। প্রাইভেট টিউটার রাখার ক্ষমতা নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের এক সাধু অপরেশকে পড়ান। আমরা স্বামীজি স্বামীজি করি, অপরেশ স্বামীজিকে তার ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছে। অপরেশ বলে, ঠাকুর আমার সব কেড়ে নিয়ে খুব ভালো করেছে। ঠাকুর, মা, স্বামীজি ছাড়া আমার আর কেউ নেই এই পৃথিবীতে। আমরা এসব বুঝি না, তবে এটা বুঝি অপরেশ একেবারে অন্য রকমের। যেমন দেখতে সুন্দর, সেইরকম সুন্দর মন।

অপরেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে — কেউ আসবে? সাহস আছে? আমরা চারজন এগিয়ে গেলুম। হেডস্যার আসছিলেন, অপরেশ বললে — আপনাকে চিনেছি স্যার। কথা আর কাজ এক করতে পেরেছেন। আপনি পরে আসবেন।

।। চার।।

অপরেশ যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে বিষ্ণুদের বাড়ি নয়।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম,— যাচ্ছিস কোথায়?

ফোর্স আনতে। আর একটা কথাও বলবি না। শুধু দেখে যা। আমরা একটা অন্ধকার পাড়ায় এলুম। খুব খারাপ জায়গা। মেয়েরা ঘুরছে। অপরেশ হন হন করে হেঁটে একটা সাবেক কালের বাড়িতে ঢুকল। গোটা বাড়িটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। পেছন দিকের একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

ঘরে একটা ডিভান। ডিভানে বলিষ্ঠ চেহারার এক যুবক আড় হয়ে শুয়ে আছে। আর চারজন মেঝেতে বসে আছে বেশ আয়েস করে। পেছন দিকের দরজাটা খোলা। সেখানে একটা মাঠ। দরজার ধারেই পাঁচটা মোটর সাইকেল অন্ধকারে চকচক করছে। মাঠের ওপারে বড়ো রাস্তা। আলো জ্বলছে। রাস্তার ওপারে জমজমাট বাজার, দোকানপাট, নতুন নতুন বাড়ি। সেটা পেরুলেই রেললাইন। আবার অন্ধকারের এলাকা। মেঝেতে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে একজন খুব সুন্দর গলায় রবীন্দ্রনাথের গান গাইছে — তোমার অসীমে।

অপরেশ ঘরে ঢুকেই বললে, — নিবারণদা, উঠে পড়, অ্যাকসান।

— আবার কী হল? আজ যে আমার অফ ডে। ঠাকুরের জন্মদিন বুধবারে আমি কোনো কাজ করি না।

— ঠাকুরেরই কাজ। তপার দল আমাদের এক মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে ঢুকে অত্যাচার করছে। স্যার হাসপাতালে আই সি ইউতে পড়ে আছেন।

— কেসটা কী?

— মডার্ন ইলেকট্রনিকসের জগদা মণ্ডল বাড়িওয়ালা। ভাড়াটে উচ্ছেদ করে বাড়িটা প্রোমোটারকে দেবে। উৎপাত চলছে অনেক দিন ধরে। স্যার হাসপাতালে। এই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে।

— তোর প্ল্যানটা বল? তোর মাথা আমার চেয়ে অনেক ভালো।

আমরা পাঁচটা বাইকে চড়ে সোজা জগদার ঠেকে যাব। কোথায় এই সময়ে থাকে তুমি জান। আমিও জানি। এখন সে খুব দুর্বল। সঙ্গে মেশিন রাখে। চালাতে জানে না। যদি ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করে সোজা তুলে নিয়ে যাব ওর গুরুর বাড়িতে। সেখান থেকে মোবাইলে তপাকে বলবে। যদি না বলতে চায় বারুইপুরে তোমার ডেরায় ডামপ।

— মন্দ বলিস নি, তপা তো ওইটার কুত্তা। চল তা হলে।

যে গান গাইছিল, সে এবার গাইতে লাগল, — কোন্ খেলা যে খেলবে কখন।

।। পাঁচ।।

পাঁচখানা মোটর সাইকেল এক সঙ্গে পাড়ায় ঢুকল। বিকট শব্দে। আমরা অবাক। জগদার ফূর্তির ডেরার সামনে আমাদের বিদ্যায়তনের অন্তত দুশো ছেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভেতরে ঢুকে আরো অবাক। জগদা কাঁদছে, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের হেডস্যার, বাংলারস্যার, আর ব্যায়ামেরস্যার। বেশ একটা নাটক। ব্যায়ামস্যার ঘন ঘন ঢেঁকুর তুলছেন।

আমরা যখন ঢুকলুম তখন হেডস্যার বললেন, — জগদা! তুমি আমাদের এক্স স্টুডেন্ট। তোমার বাবা ছিলেন অতি সম্মানিত, সাধক মানুষ। ভগবান তোমাকে কিছু কম দেননি, তোমার এই অধঃপতন। গুণ্ডারাজ একদিন শেষ হবে। তখন তুমি কী করবে? বাইরে তাকিয়ে দেখ আমার দুশো ছাত্র হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায়। আর এই তো আমাদের নিবারণ এসে গেছে। নিবারণকে তুমি চেন নিশ্চয়।

জগদা হাঁ করে চেয়ে আছে। ফোলা ফোলা মুখ। কাতলা মাছের মতো চোখ। বাবু আবার মদ খাচ্ছিলেন। সামনের বার ইলেকশানে দাঁড়াবে। এইসব লোক সমাজের মাথা হবে!

হেডস্যার বললেন, — যে বাপের পরিচয় দিতে গিয়ে ছেলে-মেয়ের মাথা হেঁট হয়, তারা তো অরফ্যান। তুমি যখন তোমার পিতার পরিচয় দেবে লোকে বলবে আম গাছে আমড়া হয়েছে। শোনো জগদা আমার শরীরে বিপ্লবীর রক্ত বইছে। এখুনি তোমার সাজান-গোজান দোকানটা আমার ছেলেরা চুরমার করে দিতে পারে।

জগদা উঠে দাঁড়াল। টলছে। বললে, — আর আমাকে কিছু বলবেন না স্যার। আমি নিজে যাচ্ছি ক্ষমা চাইতে।

একটা মিছিল। পাঁচখানা মোটর সাইকেল আগে। তারপর আমাদের তিনজন স্যার। তারপর আমরা। বিষ্ণুদের বাড়ির সামনের রাস্তায় মালপত্র ডাঁই। বিষ্ণুর মা আর দিদি সামনের বাড়ির রকে চুপ করে বসে আছেন। আর বাঙালি ভদ্দরলোকেদের যা রীতি, সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। আমাদের মিছিল দেখে সব পালাচ্ছে।

নিবারণ একটার হাত চেপে ধরে বলছে, পালাচ্ছিস কোথায়! বাকি মজাটা দেখে যা। এর ফুলপ্যান্টটা হাফপ্যান্ট করে দে। প্রতিবাদ না করে

এই পাড়ার যারা মজা দেখছে তাদের কটার বাড়ি আজ ভাঙচুর হবে। এক সঙ্গে দুশো ছেলে চিৎকার করে উঠল, — হবে।

পটাপট দরজা জানালা বন্ধ হচ্ছে। রক, বারান্দা সব খালি।

তপা বেরিয়ে এসেছে। হেডস্যার বললেন — তুমি আমাদের স্কুলের ছাত্র ছিলে। পরিচয় দিতে লজ্জা করে। তোমার বাবা ছিলেন সেক্রেটারি। লেখাপড়ায় তুমি ভালোই ছিলে। অধ্যাপক না হয়ে গুণ্ডা হয়েছ। খুব গর্বের কথা!

তপা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে।

হেডস্যার বললেন, — তোমার কাছে তো রিভলভার আছে, যে রিভলভার দিয়ে স্বদেশি অত্যাচারী ইংরেজদের মারত, তুমি আমাকে সেটা দিয়ে মেরে ফেলো। এ লজ্জা আর সহ্য হচ্ছে না।

একে একে সব মাল ভেতরে উঠে গেল।

জগদা বললে, — কালই আমি বাড়িটা আপনাদের নামে রেজেষ্ট্রি করে দেবো।

বিষ্ণুর মা ধীর শান্তগলায় বললেন, দান আমরা নিই না। উনি অসুস্থ, বিপদে পড়েছি, সময় হলেই উঠে যাব।

জগদা বললে, — বাড়িটা তা হলে আমি সুন্দর করে সারিয়ে দেবো। যত দিন ইচ্ছে আপনারা থাকবেন। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন।

বাংলারস্যার ইস করলেন।

ব্যায়ামস্যার বললেন, — কি হল গোবর মাড়ালেন?

— না, না, পরপর দুটো ক্রিয়া আপনারা থাকবেন, মার্জনা করবেন।

— দুটো নম্বর কেটে নিন!

সঞ্জয় আমার কানে কানে বললে, — ইস আলুকাবলিটা।

হেডস্যার উঁচু রকে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা সব রাস্তায়। রাস্তার আলো তাঁর মুখে এসে পরেছে। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। হাসছেন আর বলছেন, আমি আমার পেসমেকারটা খুলে ফেলে দিতে পারি। তোমাদের সকলের হৃদয়ের শক্তিতে আমি আজ শক্তিমান। তোমরা আমার গর্ব।

আমরা সবাই চিৎকার করে বললুম, আপনাকে আমরা কোনোদিন ভুলব না স্যার। কোনোদিন ভুলব না।